শ্রেষ্ঠ উর্দুগল্প

প্রথম খণ্ড

চি রা য় ত গ্র ন্থ মা লা

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

শ্রেষ্ঠ উর্দু গল্প

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা
শহিদুল আলম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১২৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0125-6

ভূমিকা

উর্দু একটি ইন্দো-আর্য ভাষা যার উৎপত্তি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে—দিল্লির আশপাশে। মোঘল রাজত্বকালেই উর্দুকে একটি পৃথক সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে ১৯৪৭-এর দেশভাগের আগ পর্যন্ত উত্তর ভারতের কতিপয় অঞ্চলে উর্দু আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে হিন্দির পাশাপাশি ব্যবহৃত হত। বিভাগের পর উর্দুভাষী এক বিপুল জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমায়, থেকেও যায় কিছু ভারতে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত *কলিয়ার'স এনসাইক্লোপেডিয়া'র* তথ্যানুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুভাষী জনসংখ্যা প্রায় তিন লাখের মতো। আর ভারতে রয়েছে প্রায় আড়াই লাখের কাছাকাছি। এই সংখ্যা নিশ্চিত এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাবি বেলুচি, সিন্ধি, পশতু ইত্যাদি।

তাহলে বলা যায়, বাংলাসাহিত্য বলতে যেমন আমাদের মনে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের মিশ্র একটি চেহারা ভেসে ওঠে, উর্দু সাহিত্যের বেলায়ও ঠিক তাই। অর্থাৎ উর্দু ভাষায় শিল্পজ উৎকর্ষ ঘটেছে উভয় অঞ্চল—পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতে। যে কারণে এই ভাষার সাহিত্যে আমরা পাই উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখাকে উতরানো বিচিত্র স্থান-কাল-পাত্রের বিচিত্রতর সমাবেশ।

মোটামুটিভাবে উর্দু সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব-পর্ব থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রধান লেখক হিসেবে যারা নিজেদের ভাষা-বৃত্ত ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন আমরা তাদেরকেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নির্বাচিত গল্পগুলোও সিংহভাগ ক্ষেত্রে যাতে লেখকদের প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা হয় সেদিকে সম্ভাব্য সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। ফলত এটিকে উর্দু কথাসাহিত্যের একটি প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ সংকলন বললে অত্যুক্তি হবে না। বিব্রতকর ঠেকলেও এ-কথা সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যথার্থ অর্থে উর্দু-গদ্য সাহিত্যে কোনো কাজ হয়নি। এর প্রধান উৎকর্ষ ঘটে বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ, ইসলামি জাগরণ এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এই অনুভূতি ও বোধগুলোই এক পর্যায়ে উর্দু সাহিত্যের প্রগতিশীল আন্দোলনে রূপ নেয়। জনৈক উর্দু সাহিত্য সমালোচকের তথ্যানুযায়ী, 'এই আন্দোলন সোচ্চার হয়ে ওঠে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ যে বছর মুন্সী প্রেমচন্দের মৃত্যু হয় সেই থেকে এবং তুঙ্গে ওঠে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি। এই সময় পর্যায়ে উর্দু সাহিত্যজগতে অনেক সমৃদ্ধ উপলব্ধির জন্ম হয়।' এরপরে আন্দোলনের রূপ আর প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের দরজা দিয়ে আরো কিছু নতুন উপাদান এসে এখানকার লেখকদের আলোড়িত করে।

এই তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যের বিরানভূমিতে একা একা যে স্বর্ণোদ্যান রচনা করেছিলেন (বিশেষ করে উর্দু গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে), উর্দু সাহিত্যের আধুনিক লেখকরা তাকেই ভিত্তিভূমি ধরে নিয়ে সেখান থেকেই তাদের যাত্রা শুরু করেছেন। এই ব্যাপারটা আরেকটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

প্রেমচন্দের নামোল্লেখের আগে-পিছে কিছু বিশেষণ যুক্ত করা হয় কেন? উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় মানুষের মাতৃভাষা (হিন্দি) উর্দু। বিশ শতকের গোড়াতেও এই ভাষার সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি, গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে যুক্ত হয়নি সমকাল, না-মাটি না-মানুষ কোনো কিছুরই পরিচয় মেলেনি এখানকার সাহিত্যকর্মে। অতীতের অবক্ষয়ী রোমান্টিকতার অলীক অন্ধকারে ডুবে ছিল যেন সবাই, জীবনের সবটুকুকে আড়ালে রেখে এই সমাজের সাহিত্যিক ধারা যেন জীর্ণতায় ধুকপুক করছিল। প্রেমচন্দের আবির্ভাব এরই মধ্যে। বারাণসীর এক অখ্যাত গাঁয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মে, পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানির চাকরি করতে করতে প্রেমচন্দ উর্দু সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তুললেন। সমকালীন মানুষগুলো, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের আটপৌরে কৃষক উর্দু সাহিত্যে এই প্রথমবারের মতো উঠে এল তাদের ভাবনা-বেদনা, সুখ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, দোষ-গুণের সামগ্রিক পরিচয় নিয়ে—জীবনের অনাবিল প্রসন্ন স্রোতধারায় উর্দু সাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। কথাটি হিন্দি সাহিত্যের বেলাতেও প্রযোজ্য; কেননা এই পথিকৃৎ লেখক দুটো ভাষাতেই অবিরল লিখে গেছেন। তাই প্রেমচন্দ আধুনিক উর্দু (সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি) সাহিত্যের 'পিতৃস্থানীয়'। এই কাজগুলো তিনি সম্পাদন করেছিলেন 'কফন', 'সদগতি', 'পৌষের রাত'-এর মতো বিস্ময়কর গল্প এবং 'সেবাসদন', কিংবা 'গোদান'-এর মতো কালজয়ী উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। প্রবহমান তরল রোমান্টিক সেন্টিমেন্টের বিপরীতে তিনি রূঢ়, বর্ণহীন, কঠোর সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপকে মুখোমুখি দাঁড় করালেন পাঠকের। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত করলেন মানুষের ওপর এক গভীরতম আস্থা : মানুষ মূলত ভালো, মূলত মহৎ, সে দৃঢ়পণ চেষ্টায় নিজেকে সকল সামাজিক পাপ-পঙ্কিলতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে সার্থক হয়ে উঠতে পারে...।

এভাবেই তিনি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে যে বলিষ্ঠ হাল তুলে দিয়ে গেলেন, সেই হাল ধরেই পালে বাতাস লাগিয়ে নবীন লেখকদের এগিয়ে যেতে আর বাধা রইল না।

প্রগতিশীল আন্দোলন উর্দু সাহিত্যে একঝাঁক মেধাবী লেখকের জন্ম দিয়েছিল। বয়সের দিক থেকে দু-এক বছর ছোট-বড় হলেও এরা সবাই মোটামুটি সমসাময়িক ছিলেন : কৃষণ চন্দর, রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, ইসমত চুগতাই, সাদত হাসান মান্টো, খাজা আহমদ আব্বাস, কুররাতুল আইন হায়দার, কুদরতুল্লা শাহাব, গোলাম আব্বাস প্রমুখ এদের অন্যতম। আজকের উর্দু কথাসাহিত্যের ভেতরে যে বৈচিত্র্যের বিবিধ আস্বাদ আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করি তা এদেরই দান।

এই নবীন গোষ্ঠীর মধ্যে আবার কৃষণ চন্দর-এর নামটি নানা কারণে অধিক উচ্চারিত। তাঁর রচনার নৈপুণ্য, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ক্ষিপ্রতা, বিষয়মাহাত্ম্য ও বাস্তবতা সহজেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ৪৭-এর দেশভাগ, দাঙ্গা, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিতরাই তাঁর লেখার একটি অতি প্রিয় বিষয়। পেশাদার লেখক ছিলেন বলেই যদিও বিস্তর লিখতে হয়েছে তাঁকে, তবু তেলেঙ্গানার পটভূমিতে

লেখা কৃষক আন্দোলনের কাহিনী 'যব ক্ষেত জাগে' দেশভাগের পটভূমিকার 'গাদ্দার' উপন্যাস, একই বিষয়ে লেখা ছোটগল্প 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' পাঠকের মনে স্থায়ী দাগ কেটে যায়। কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক চেতনা এবং ইতিহাসবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, শানানো। নির্বাচিত অন্য দুটি গল্প 'জঞ্জালবুড়ো' এবং 'জামগাছ'-এ কৃষণ চন্দরের সেই চেতনা ও বোধেরই পরিচয় মেলে।

রাজেন্দ্র সিংহ বেদীকে বলা হয় উর্দু সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক ধারার প্রবর্তক। তাঁর গল্পের স্বর গাঢ় এবং গম্ভীর। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, সেখানে বর্ণহীন বাস্তবতার প্রক্ষেপ আর মনস্তত্ত্বের চাপ সব মিলিয়ে যেখানে একটি সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে অচেনা মানুষ, সহজ সম্পর্ক হয়ে ওঠে অজানা সম্পর্ক... সেই জটিল ও অজানা-অচেনা মানুষজন রাজেন্দ্র সিংহ বেদীর প্রিয় বিষয়-আশয়।

উর্দু সাহিত্যে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত লেখক হিসেবে সাদত হাসান মান্টোর খ্যাতি রয়েছে। হয়তো এই ব্যাপক পরিচিতির পেছনে আছে মান্টোর বিরুদ্ধে সেন্সরশিপের বারংবার মামলা দায়ের-এর ঘটনা। আশ্চর্য এই যে মান্টোর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোই সেন্সরশিপের কোপানলে পড়েছিল। 'ধোঁয়া', 'খুলে দাও', 'ঠাণ্ডা গোশ্‌ত', 'গন্ধ', এগুলো সবই অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনিতেও মান্টো সমাজের নিঃস্ব, রিক্ত, পতিতদের নিয়েই কাজ করতেন, অন্ধগলির পতিতাদের চরিত্র প্রকাশ্য আলোয় তুলে ধরতেন—যা কর্তাদের কর্তব্যনিষ্ঠ চোখে প্রায়ই দৃষ্টিকটু ঠেকত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মান্টো মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

সাদত হাসান মান্টোর নামের সঙ্গে সঙ্গে অবধারিতভাবেই উচ্চারিত হয় আরেকটি নাম—তিনি ইসমত চুগতাই। উর্দু সাহিত্যে দুজনের আগমন প্রায় এক সঙ্গে এবং আবির্ভাবের শুরুতে দুজনেই হুলুস্থূল তুলেছিলেন উর্দু সাহিত্যে। মান্টোর মতো ইসমত চুগতাই-কেও একাধিকবার অশ্লীলতার দায়ে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। দুজনের মামলা চেলেছে প্রায় একই সঙ্গে। ৩০-৪০-এর দশকে দুজনেই একসঙ্গে বোম্বাই সিনেমার গল্প লিখেছেন।

যাই হোক, ইসমত চুগতাই-এর মৌলিক হাত মূলত ছোটগল্পে। তাঁর বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা, লেখার ভঙ্গি নিরুচ্ছ্বাস অথচ সংবেদনশীলতাই তাঁর গল্পকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। উত্তর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের অবস্থা এমন ব্যাপক ও স্পর্শকাতরভাবে ফুটিয়ে তুলতে খুব কম লেখকই পেরেছেন। এখানে তাঁর নির্বাচিত 'দুই হাত' গল্পটি ছাড়াও 'গুডডির নানী' একটি উৎকৃষ্ট লেখা।

খাজা আহমদ আব্বাস (১৪ই জুন, ১৯১৪)-এর জন্ম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথে। ভাষার ব্যবহারে ইনি অত্যন্ত সহজ, সাদামাটা। শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। 'ইনকেলাব' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা কুররাতুল আইন হায়দারকে তিনি বিয়ে করেছিলেন যদিও তা দীর্ঘদিন টেকেনি। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গল্প লেখার চাইতে চলচ্চিত্রের কাহিনী ও সংলাপ রচনা, চিত্র পরিচালনা ও চিত্র প্রযোজনায় মনোনিবেশ করেন।

উর্দু কথাসাহিত্যে আমরা উপরে আলোচিত লেখকদের সঙ্গে যেভাবে পরিচিত, কুররাতুল আইন হায়দার, কুদরতুল্লা শাহাব কিংবা গোলাম আব্বাস-এর সঙ্গে ঠিক

সেভাবে পরিচিত নই। যদিও এই সংকলনভুক্ত তাঁদের গল্পগুলো স্ব-উজ্জ্বলতায় ভাস্বর এবং উর্দু গল্পের ধারাবাহিক আলোচনায় এঁরা এসে পড়েন অনিবার্যভাবেই।

এখানে একটি কথা উল্লেখ প্রয়োজন যে উর্দু সাহিত্যের এক ব্যাপক অংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখক অনুবাদ করেছেন। অথচ এই সংকলনের জন্য নির্বাচনকালে যখন অনুবাদ গ্রন্থগুলোর মুখোমুখি হলাম, আমরা দেখলাম অধিকাংশ অনুবাদকই ন্যূনতম কোনো শৃঙ্খলা মেনে চলেননি। ফলে ঘটনা ঘটেছে এরকম যে, পাঠক একজন উর্দু গল্পকারের অনেক গল্প পড়ছেন ঠিকই কিন্তু তার পাঠ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে সেরা গল্পগুলো। দ্বিতীয়ত, রূপান্তরিত গল্পগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আড়ষ্টতাও ধরা পড়েছে। তবু অনুবাদকদের মিলিত চেষ্টায় উর্দু ভাষার একটা ঐশ্বর্যময় সম্ভার বাংলা ভাষায় অনূদিত ছিল বলেই দুই খণ্ডে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্প বের করা সম্ভব ছিল। অনুবাদকদের কাছে আমাদের ঋণ তাই অপরিশোধ্য। ভবিষ্যতে নতুন অনুবাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উর্দু গল্পকে সম্পন্নতর করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এই গ্রন্থে উর্দু কথাসাহিত্যের সেরা লেখকদের সেরা গল্পগুলোর সন্নিবেশের ফলে পাঠক একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন—আমরা এই আশা রাখি।

২২/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ঢাকা

শহিদুল আলম

সূচি

কফন ॥ প্রেমচন্দ ১১

পৌষের রাত ॥ প্রেমচন্দ ১৮

পেশোয়ার এক্সপ্রেস ॥ কৃষণ চন্দর ২৩

জামগাছ ॥ কৃষণ চন্দর ৩১

তোমার দুঃখ আমাকে দাও ॥ রাজেন্দ্র সিংহ বেদী ৩৬

ঠাণ্ডা গোশ্‌ত ॥ সাদত হাসান মান্টো ৫৬

আনন্দী ॥ গোলাম আব্বাস ৬০

চড়ুইপাখি ॥ খাজা আহমদ আব্বাস ৭০

পর্যটক ॥ কুররাতুল আইন হায়দার ৭৩

অনুবাদক

কফন ॥ ননীগোপাল শূর
পৌষের রাত ॥ ননীগোপাল শূর
পেশোয়ার এক্সপ্রেস ॥ সৌরীন ভট্টাচার্য
জামগাছ ॥ কমলেশ সেন
তোমার দুঃখ আমাকে দাও ॥ ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
ঠাণ্ডা গোশ্‌ত ॥ জাফর আলম
আনন্দী ॥ আখতার-উন-নবী
চড়ুইপাখি ॥ জাফর আলম
পর্যটক ॥ মোস্তফা হারুণ

কফন

প্রেমচন্দ্র

ঝুপড়ির দরজায় বাপ-বেটা দুজনে নিভে যাওয়া আগুনটার সামনে চুপচাপ বসে। ওদিকে ঘরের ভেতরে ছেলের জোয়ান বউ বুধিয়া প্রসববেদনায় আছাড়পাছাড় খাচ্ছে। থেকে-থেকে ওর মুখ দিয়ে এমন কলজে-কাঁপানো আওয়াজ আসছে যে ওরা দুজন বুকে পাথর চেপে কোনও মতে তা সহ্য করছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। সমস্ত গ্রামখানা মিশে গেছে অন্ধকারে।

ঘিসু বলে—'মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাটা দিন দৌড়ঝাঁপ করেই কাটাল। যা না, গিয়ে একবারটি দেখে আয় না।'

মাধব ক্ষেপে দিয়ে বলে—'মরবেই যদি তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে করবটা কী?'

'পরাণে তোর একটুও দরদ নেই রে! সারাটা বছর যার সঙ্গে সুখে-শান্তিতে ঘর করলি, তার সঙ্গেই অমন বেইমানি!'

'আমি যে ওর ছটফটানি আর হাত-পা ছোঁড়া চোখে দেখতে পারছি না।'

চামার-বাড়ি; সারা গাঁয়ে ওদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজে যায় তো তিনদিন ঘরে বসে থাকে। মাধবটা কাজে এত ফাঁকিবাজ যে আধঘণ্টা কাজ করে তো একঘণ্টা বসে ছিলিম টানে। তাই ওরা কোথাও মজুরি পায় না। ঘরে যদি একমুঠো খাবার থাকে তো ব্যস্, ওরা যেন কাজ না-করার শপথ নেয়। দুচারটে উপোস দেবার পর ঘিসু গাছে উঠে কাঠকুটো ভেঙে আনে আর মাধব বাজারে গিয়ে বেচে আসে সেগুলোকে; তারপর যতক্ষণ সে পয়সা হাতে থাকে দু'জনে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। আবার যখন উপোস করার হাল হয়, তখন আবার হয় কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে কিংবা জনমজুরির খোঁজে বের হয়। গাঁয়ে কাজের কমতি নেই। চাষাভুষোর গাঁ, খেটে-খাওয়া মানুষের হাজার রকমের কাজ। তবু ওদের দুজনকে লোকে কেবল তখনি ডাকে যখন দুজনের মজুরি দিয়ে একজনের কাজটুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ দুজন যদি সাধু-সন্ন্যাসী হত, তবে সন্তোষ এবং ধৈর্যের জন্য কোনো সংযম-নিয়মেরই আবশ্যকতা হত না, কারণ এ-সব ছিল ওদের স্বভাবজাত। ছন্নছাড়া অদ্ভুত জীবন ওদের। ঘরে দুচারখানা মাটির বাসন ছাড়া সম্পত্তি বলতে কিচ্ছু নেই। ছেঁড়া কাপড় পরে নিজেদের নগ্নতাকে কোনোমতে ঢেকে জীবন কাটায়। সংসারের সব রকমের ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। গালাগালি খায়, খায় মারধরও, তবুও কোনো দুঃখ নেই। গরিব এত যে, পরিশোধের আশা লেশমাত্র নেই জেনেও সবাই ওদের কিছু না-কিছু ধার

দেয়। মটর বা আলুর সময় অন্যের ক্ষেত থেকে মটর কিংবা আলু চুরি করে তুলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভেজে বা পুড়িয়ে খেয়ে নেয়; কিংবা পাঁচদশ গাছা আখ ভেঙে এনে রাতের বেলা বসে-বসে চোষে। ঘিসু এই রকম আকাশবৃত্তিতেই ষাট-ষাটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে; আর মাধবও বাপের বেটা, অনুসরণ করে চলেছে তারই পদাঙ্ক; বরং বলা চলে বাপের নামকে আরও উজ্জ্বল করে চলেছে। এই যে এখন দুজনে আগুনের সামনে বসে আলুগুলো পোড়াচ্ছে তা-ও কারো-না-কারো ক্ষেত থেকে তুলে আনা। ঘিসুর বউটা তো অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করেছে। মাধবের বিয়ে হয়েছে এই গত বছর। মেয়েটি এদের ঘরে এসে পরিবারে একটা শৃঙ্খলা এনেছে। গম পিষেই হোক বা ঘাস তুলেই হোক সেরটাক আটার যোগাড় সে ঠিক করে নিত আর এই বেহায়াদুটোকে পিণ্ডি গেলাত। মেয়েটা ঘরে আসার পর এরা দু'জন আরও আলসে, আরও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; বরং বলা চলে ওদের গুমরও যেন বেড়ে গিয়েছিল। কেউ কাজ করতে ডাকলে ইদানিং বিনাদ্বিধায় দুনো মজুরি হেঁকে বসত। এই মেয়েটিই আজ এদিকে প্রসববেদনায় মরে যাচ্ছে আর এরা দু'জন বোধকরি এই আশায় অপেক্ষা করে আছে যে, ও চোখ বুঁজলে আরাম করে ঘুমোতে পারবে।

ঘিসু আলু বের করে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে বলে, 'গিয়ে দেখ্ তো কী অবস্থা বেচারির! পেত্নীর নজর লেগেছে, তাছাড়া আর কি? এসব ঝাড়াতে-টাড়াতে তো ওঝা কম করেও একটা টাকা চাইবে!'

মাধবের ভয়, সে ঘরে ঢুকলে ঘিসু আলুগুলোর বেশির ভাগটা-না সাবাড় করে দেয়। বলে—'ওর কাছে যেতে আমার ভয় করছে।'

'ভয় কিসের রে, আমি তো এখানে রয়েছিই!'

'তাহলে তুই-ই গিয়ে দেখ্ না।'

'আমার বউ যখন মারা গিয়েছিল, আমি তিনদিন ওর কাছ থেকে নড়িনি। আর তাছাড়া আমাকে দেখলে ও লজ্জা পাবে না? কোনোদিন যার মুখ দেখিনি, আজ তার উদলা গা দেখব! ওর তো এখন গা-গতরের হুঁশ-টুশও নেই। আমাকে দেখে ফেললে ভালো করে হাত-পা-ও ছুঁড়তে পারবে না।'

'আমি ভাবছি যদি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? শুঁঠ, গুড়, তেল কিছুই তো ঘরে নেই।'

'সবই এসে যাবে। ভগবান দিক তো! যারা এখন একটা পয়সা দিচ্ছে না, তারাই কালকে যেচে এসে টাকা দেবে। আমার নটা ছেলে হয়েছে, ঘরে তো কোনোদিন একটা কানাকড়িও ছিল না, তবু ভগবান কোনও-না-কোনও মতে কাজ তো চালিয়ে দিয়েছেন।'

যে-সমাজে দিনরাত খেটে-খাওয়া মানুষের হাল ওদের চাইতে বেশি কিছু ভালো নয়, যেখানে চাষিদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা মুনাফা লোটে তারাই চাষিদের চেয়ে অনেক বেশি সংগতিপন্ন, সে-সমাজে এ-ধরনের মনোবৃত্তির সৃষ্টি হওয়া কিছু অবাক হবার মতো কথা নয়। বরং বলব ঘিসু চাষিদের চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান, তাই সে নির্বোধ চাষিদের পালে না-ভিড়ে আড্ডাবাজদের কুৎসিত দলে গিয়ে জুটেছিল। তবে হ্যাঁ, ওর

মধ্যে এতটা ক্ষমতা ছিল না যে, আড্ডাবাজদের নিয়মকানুন ঠিকঠাক রপ্ত করে। তাই ওর দলভুক্ত অন্য সবাই যেখানে গাঁয়ের মাতব্বর কিংবা মোড়ল হয়ে গেছে, সেখানে সারা গাঁ ওর নিন্দে করে। তবু এ-সান্ত্বনাটুকু ওর আছে যে, ওর হাঁড়ির হাল খারাপ হলেও অন্তত পক্ষে ওকে ওসব চাষিদের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। ওর সরলতা এবং নিরীহতা থেকে অন্যরা অনুচিত মুনাফা লুটতে পারে না।

দুজনে আলু বের করে-করে গরম-গরম খেয়ে চলে। কাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। তাই আলু ঠাণ্ডা হবার তর সইছে না। ফলে বারকয়েক দুজনেরই জিভ পুড়ে যায়। খোসা ছাড়ালে আলুর ওপরটা খুব বেশি গরম বলে মনে হয় না, কিন্তু দাঁতের নিচে পড়া মাত্রেই ভেতরটাকে, জিভ, গলা আর টাকরাকে পুড়িয়ে দেয়। ওই অঙ্গারটাকে তখন মুখে রাখার চাইতে অনেক বেশি ভালো পেটের ভেতরে পাচার করে দেয়া। সেখানে ওটাকে ঠাণ্ডা করার মতো যথেষ্ট বস্তু রয়েছে। তাই দুজনে গপাগপ গিলে ফেলছে। যদিও এ করতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়ছে ওদের।

খেতে-খেতে জমিদারের বিয়েতে বরযাত্রী যাবার কথা ঘিসুর মনে পড়ে যায়। বছর কুড়ি আগে সেই বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল। সেই ভোজ খেয়ে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল তা তার জীবনে মনে রাখার মতো ঘটনা, আজও সে স্মৃতি তার উজ্জ্বল হয়ে আছে। বলে—'ওই ভোজের কথা ভুলতে পারি না। তারপর সারা জীবনে অমন খাবার আর পেট পুরে খাইনি। মেয়ের বাড়ির লোকেরা সবাইকে পেট ভরে পুরি খাইয়েছিল, সব্বাইকে! ছোট-বড় সবাই পুরি খেয়েছিল, একেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা! চাটনি, রায়তা, তিন রকমের শুকনো তরকারি, একটা ঝোল, দই, মিষ্টি। কী বলব, এ-ভোজে সেদিন কী আস্বাদ পেয়েছিলাম! কোনও নিষেধ-মানা ছিল না। যে-জিনিস যত খুশি চেয়ে নাও, যত চাই খাও। সবাই অ্যাত্ত-অ্যাত্ত খেয়েছিল যে, কেউ জল পর্যন্ত খেতে পারেনি। পরিবেশকরা পাতে গরম-গরম, গোল-গোল, সুগন্ধি কচুরি দিয়েই। চলছিল। যত মানা করি আর চাই না, পাতের উপর হাতচাপা দিয়ে রাখি, কিন্তু তবু ওরা দিয়ে যাচ্ছিল তো যাচ্ছিলই। তারপর যখন আঁচিয়ে এলাম, তখন পান-এলাচও পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার তখন পান খাবার হুঁশ কোথায়। দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিলাম না। চটপট গিয়ে আমার কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছিলাম। এত দিলদরিয়া ছিলেন ওঁরা।'

মাধব মনে-মনে জিনিসগুলোর স্বাদ কল্পনা করতে-করতে বলে—'আজকাল কেউ তো আর আমাদের অমন ভোজ খাওয়ায় না।'

'আজকাল আর খাওয়াবে কে, খাওয়াবেই-বা কী? ওই জমানাটাই ছিল আলাদা। এখন তো সবাই পয়সা বাঁচানোর ধান্দাতেই আছে। বিয়ে-সাদিতে খরচ করে না, ক্রিয়া-করমে খরচ করে না। বলি গরিবগুলানের পয়সা লুটে-লুটে রাখবি কোথায়? লুটবার বেলায় ক্ষ্যামা নেই, শুধু খরচের বেলাতেই যত্ত হিসাব।'

'তুমি খানবিশেক পুরি খেয়েছিলে বোধহয়?'

'বিশখানার বেশিই খেয়েছিলাম।'

'আমি হলে পঞ্চাশখানা সেঁটে ফেলতাম।'

'খানপঞ্চাশের কম আমিও খাইনি। তাগড়া জোয়ানমদ্দ ছিলাম। তুই তো আমার আদ্দেকও নোস।'

আলু খাওয়া হয়ে গেলে দু'জনেই জল খেয়ে ওখানেই আগুনের সামনে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে পেটে পা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন দুটো বড়-বড় অজগর কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে।

ওদিকে বুধিয়া সমানে কঁকিয়ে চলেছে।

সকালে ঘরে ঢুকে মাধব দেখে বউটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওর মুখের উপর মাছি ভন্‌ভন্ করছে। উপরদিকে চেয়ে রয়েছে পাথরের মতো স্থির নিশ্চল দুটি চোখ। সমস্ত শরীর ধুলোয় মাখামাখি। ওর পেটে বাচ্চাটা মরে গেছে।

মাধব ছুটতে-ছুটতে ঘিসুর কাছে যায়। তারপর দুজনে জোরে-জোরে হাহাকার করতে-করতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাড়াপড়শিরা কান্নাকাটি শুনে ছুটতে-ছুটতে আসে এবং চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই হতভাগা দু'জনকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু বেশি কান্নাকাটির সময় নেই। শবাচ্ছাদনের নতুন কাপড় আর কাঠের ভাবনা ভাবতে হবে। এদিকে ঘরে পয়সা তো যেমন চিলের বাসায় মাংস তেমনি শূন্য।

বাপ-বেটা দুজনে কাঁদতে-কাঁদতে গাঁয়ের জমিদারের কাছে যায়। উনি এই দুজনের মুখই দেখতে পারেন না। বারকয়েক এ দুজনকে নিজের হাতে পিটুনি দিয়েছেন চুরি করেছে বলে কিংবা কথা দিয়ে ঠিকমতো কাজে আসেনি বলে। জিজ্ঞেস করেন—'কী হয়েছে রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? আজকাল তো কোথাও তোর দেখা মেলা ভার। মনে হচ্ছে যেন এ গাঁয়ে থাকার ইচ্ছে নেই তোর।'

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা চোখে বলে—'কত্তামশায় গো! বড় বিপদে পড়েছি! মাধবের বউটা কাল রাতে মরে গেছে। সারাটা রাত ছটফট করেছে কত্তা! আমরা দুজন ওর শিয়রে বসে ছিলাম। ওষুধবিষুদ যদ্দুর পেরেছি, সব করেছি। তবুও বউটা আমাদের দাগা দিয়ে গেল, কত্তা। একখানা যে রুটি করে খাওয়াবে এমন কেউ আর রইল না। কত্তাবাবু! একেবারে পথে বসেছি। সম্‌সারটা ছারখার হয়ে গেল, হুজুর। হুজুরের গোলাম আমরা। এ-বিপদে হুজুর আপনি ছাড়া কে ওর ঘাটের দায় উদ্ধার করবে? আমাদের হাতে যা কিছু দু-চার পয়সা ছিল, সব ওষুধ আর পথ্যিতে শেষ হয়ে গেছে। হুজুর যদি দয়া করেন তাহলেই ওকে ঘাটে তুলতে পারব। আপনি ছাড়া আর কার দোরে গিয়ে হাত পাতব, হুজুর!'

জমিদারবাবু দয়ালু। তবে ঘিসুকে দয়া করার মানে তো ভস্মে ঘি ঢালা। ইচ্ছে হল বলে দেন—ভাগ, দূর হ সামনে থেকে। এমনিতে তো ডেকে পাঠালেও আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামদাজা, বদমাস কোথাকার! কিন্তু রাগ করার বা সাজা দেয়ার সময় এখন নয়। মনে-মনে গজগজ করতে-করতে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দেন। সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। ওদের দিকে ফিরেও তাকান না, যেন কোনোমতে ঘাড় থেকে আপদ দূর করেন।

জমিদারমশাই যখন দু'টাকা দিয়েছেন, তখন গাঁয়ের বেনে মহাজনেরা নিষেধ করে কী করে! ঘিসু জমিদারের নামের ঢাক পেটাতেও খুব ওস্তাদ! ওরা কেউ দেয় দু'আনা, কেউ চার আনা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঘিসুর হাতে টাকাপাঁচেকের মতো পুঁজি যোগাড় হয়ে যায়। এছাড়া কেউ গমটম দেয়, কেউ-বা কাঠ। তারপর দুপুরবেলা ঘিসু আর মাধব বাজার থেকে কফনের জন্য নতুন কাপড় আনতে যায়। এদিকে অন্যরা বাঁশ কাটতে শুরু করে।

গাঁয়ের কোমলমনা মেয়েরা এসে মৃতাকে দেখে, বেচারির অসহায় অবস্থার কথা ভেবে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে চলে যায়।

বাজারে এসে ঘিসু বলে—'ওকে জ্বালানোর মতো কাঠ তো যোগাড় হয়ে গেছে, তাই না রে মাধব?'

মাধব বলে—'হ্যাঁ, কাঠ তো অনেক হয়েছে, এখন কফন হলেই হয়।'

'তাহলে চল সস্তা দেখে একখানা কফন কিনে নিই।'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী? মড়া তুলতে-তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতের বেলায় কফন অত কে দেখতে যাচ্ছে?'

'কেমনতর যে বাজে নিয়ম সব, বেঁচে থাকতে গা ঢাকার জন্য একখানা ছেঁড়া তেনাও যে পায়নি মরলে তার নতুন কফন চাই।'

'কফনটা তো মড়ার সঙ্গেই পুড়ে যায়।'

'তা না তো কি থেকে যায় নাকি? এই টাকা পাঁচটা আগে পেলে বউটাকে একটু ওষুধ-পথ্যি খাওয়াতে পারতাম।'

দুজনেই দুজনের মনের কথাটা টের পাচ্ছে। বাজারে এখানে-ওখানে ঘুরছে তো ঘুরছেই। কখনো এ দোকানে, কখনো ও-দোকানে। নানা রকমের কাপড়—রেশমি কাপড়, সুতি কাপড় সব দেখে, কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হয় না। এই করতে-করতে সন্ধ্যা নামে। তখন দুজনেই এক দৈবী প্রেরণাবশে একটি পানশালার দরজায় এসে দাঁড়ায়, তারপর প্রায় পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা মতো ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দুজনে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গদির সামনে গিয়ে ঘিসু বলে—'সাহুজী, এক বোতল আমাদেরকেও দিন।'

এরপর কিছু চাট আসে, মাছভাজা আসে, আর ওরা দুজনে বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত মনে মদ গিলে চলে।

কয়েক ভাঁড় তড়বড় করে গেলবার পর দুজনেরই একটু-একটু নেশার আমেজ আসে।

ঘিসু বলে—'কফন দিলে হতটা কী? শেষঅব্দি পুড়েই তো যেত। বউয়ের সঙ্গে তো আর যেত না।'

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন সব দেবতাকে তার নিষ্পাপ কাজের সাক্ষী মেনে বলে—'দুনিয়ার দস্তুরই যে এই, নইলে লোকে বামুনঠাকুরদের হাজার-হাজার টাকাই-বা দেয় কেন? কে দেখছে, পরলোকে কী পাচ্ছে না-পাচ্ছে।'

'বড়লোকদের হাতে পয়সা আছে, ইচ্ছে হলে ওড়াক গে। আমাদের কাছে উড়িয়ে দেয়ার মতন আছেটা কী!'

'কিন্তু ওদের সবাইকে কী বলবি? ওরা জিজ্ঞেস করবে-না কফন কই?'

ঘিসু হাসে—'আরে ধ্যাৎ, বলব টাকা ট্যাঁক থেকে কোথায় যে খসে পড়ে গেছে, অনেক খুঁজেছি, পাইনি। ওরা বিশ্বাস করবে না ঠিকই, তবু ওরাই আবার টাকা দেবে।'

মাধবও হেসে ফেলে; এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বলে—'আহা! বড় ভালো ছিল গো বেচারি! মরেও খুব খাইয়ে গেল।'

আধ বোতলের ওপর শেষ হয়ে যায়। ঘিষু দুসের পুরি আনিয়ে নেয়। সঙ্গে চাটনি, আচার, মোটর কারি। শুঁড়িখানার সামনেই দোকান। মাধব ছুটে গিয়ে দুটো ঠোঙায় করে

সব জিনিস নিয়ে আসে। পুরো দেড়টি টাকা আরও খরচ হয়ে যায়। হাতে শুধু ক'টা পয়সা বাকি থাকে।

দুজনে এখন খোশমেজাজে বসে পুরি খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের বাঘ বনে বসে তার শিকার সাবাড় করছে। না-আছে জবাবদিহি করার ভয়, না-আছে বদনামের ভাবনা। এসব ভাবনাচিন্তাকে ওরা অনেক আগেই জয় করে নিয়েছে।

ঘিসু দার্শনিকের মতো বলে—'এই যে আমাদের আত্মা খুশি হচ্ছে, এতে কি বউ আনন্দ পাবে না?'

মাধব ভক্তিতে মাথা নুইয়ে সায় দেয়— 'খুব পাবে, আলবৎ পাবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে সগ্‌গে নিয়ে যেও। আমরা দুজনে মন খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। আজ যে খাওয়াটা খেলাম অমনটা সারাজীবনে কোনোদিন কপালে জোটেনি।'

খানিক বাদে মাধবের মনে একটা সন্দেহ জাগে। বলে—'আচ্ছা বাবা, আমরাও তো একদিন ওখানে যাব।'

ঘিসু এই সোজা সহজ প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয় না। পরলোকের কথা ভেবে এই আনন্দটাকে মাটি করতে চায় না সে।

'যদি ও ওখানে আমাদের জিগ্যেস করে তোমরা আমাকে কফন দাওনি কেন, তাহলে কী বলবি?'

'বলব, তোর মুণ্ডু।'

'জিগ্যেস তো ঠিকই করবে।'

'তোকে কে বলেছে যে ও কফন পাবে না? তুই কি আমাকে অমন গাধা ঠাউরেছিস? ষাটটা বছর কি দুনিয়াতে ঘোড়ার ঘাস কেটে আসছি। বউ কফন ঠিকই পাবে আর এর থেকে অনেক ভালো পাবে।'

মাধবের বিশ্বাস হয় না। বলে—'দেবেটা কে? পয়সা তো তুই খেয়ে ফেলেছিস। ও তো আমাকেই জিগ্যেস করবে। ওর সিঁথেয় সিঁদুর যে আমিই পরিয়েছি।'

ঘিসু গরম হয়ে বলে—'আমি বলছি ও কফন পাবে। তোর পেত্যয় হচ্ছে না কেন?'

'দেবেটা কে বলছিস-না কেন?'

'ও লোকগুলানই দেবে যারা এবার দিয়েছে। হ্যাঁ, তবে এর পরের টাকাটা আর আমাদের হাতে আসবে না।'

যেমন অন্ধকার বেড়ে চলে, আকাশের তারাগুলোর দীপ্তি বাড়ে, মদের দোকানের রঙতামাশাও তেমনি বাড়তে থাকে। কেউ গান গায়, কেউ ডিগবাজি খায়, কেউ-বা তার সাথীর গলা জড়িয়ে ধরে। কেউ তার ইয়ারের মুখে মদের ভাঁড় তুলে দেয়।

এখানকার পরিবেশে মাদকতা, হাওয়াতে নেশা। কত লোক তো এখানে এসে এক ঢোঁক খেয়েই মাতাল হয়ে পড়ে। মদের থেকেও বেশি এখানকার হাওয়া ওদের নেশা ধরায়। জীবনের দুঃখ-কষ্ট ওদের এখানে টেনে আনে। কিছু সময়ের জন্য ওরা ভুলে থাকে ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে। নাকি বেঁচেও নেই, মরেও নেই।

বাপ-বেটা দুজনে এখনো মৌজ করে-করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। সবার নজর ওদের দুজনের ওপর। কী ভাগ্য দুজনের! পুরো একটা বোতল ওদের মাঝখানে! পেট ভরে খেয়ে মাধব বেঁচে যাওয়া পুরির ঠোঙাটা নিয়ে গিয়ে একটি ভিখারিকে দিয়ে দিল।

ভিখারিটি দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ক্ষুধাতুর চোখে তাকাচ্ছিল। দেয়ার গৌরব, আনন্দ আর উল্লাসে মাধব জীবনে এই প্রথম অনুভব করে।

ঘিসু বলে—'নে রে, যা ভালো করে খা আর আশীব্বাদ কর। যার দৌলতে খাওয়া ও তো মরে গেছে। তবু তোর আশীব্বাদ ওর কাছে পৌছবে। মন খুলে পরান খুলে আশীব্বাদ কর, বড় কষ্টের রোজগারের পয়সা রে!'

মাধব আবার অকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—'ও ঠিক বৈকুণ্ঠে যাবে গো বাবা, ও বৈকুণ্ঠের রানী হবে।'

ঘিসু উঠে দাঁড়িয়ে যেন উল্লাসের তরঙ্গে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে বলে—'হ্যাঁ বাবা, বৈকুণ্ঠেই যাবে বৈকি। কাউকে কষ্ট দেয়নি, দুখ্খু দেয়নি। মরতে-না-মরতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধটি পুরিয়ে দিয়ে গেছে। ও যদি বৈকুণ্ঠে না-যাবে তো কি ওই ধুমসো-ধুমসো লোকগুলোন যাবে যারা গরিবগুলোনরে দুহাতে লুটছে আর নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলতে গঙ্গায় গিয়ে চান করছে, মন্দিরে পুজো দিচ্ছে!'

ভক্তিশ্রদ্ধার এই অনুভূতিটি তাড়াতাড়ি বদলে যায়। অস্থিরতাই নেশার বৈশিষ্ট্য, এর পর দুঃখ আর হতাশা মনে ভর করে।

মাধব বলে—'বাবা, বেচারি কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। মরল, তা-ও কত যন্ত্রণা সয়ে।'

বলে চোখে হাত-চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে। ঘিসু বোঝায়—'কাঁদচিস কেন বাবা, আনন্দ কর্। বউ এই মায়া থেকে ছুটি পেয়ে গেছে। এই জঞ্জাল থেকে রেহাই পেয়েছে। বড় ভাগ্যিমানী ছিল রে, তাই তো এত তাড়াতাড়ি মায়ামমতা কাটিয়ে চলে গেছে।'

তারপর দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে দেয়—

'ঠগিনী, কেঁয়ো নৈনা ঝমকায়ে। ঠগিনী!'

সব মাতাল এদের দুজনকে দেখছে। এরা দুজনে মত্ত হয়ে গান গেয়ে চলে। তারপর দুজনে নাচতে শুরু করে দেয়। লাফ দেয়। ঝাঁপ দেয়। পড়েও যায়। উঠে হেলেদুলে চলে। কতরকম ভাবভঙ্গি করে। অভিনয় করে। তারপর শেষ পর্যন্ত নেশায় চুরচুর হয়ে ওখানেই টলে পড়ে যায়।

পৌষের রাত

প্রেমচন্দ

হল্‌কু এসে বলে—পেয়াদাটা এসেছে। দাও, যে কটা টাকা রেখেছিলাম, দিয়ে দিই ওকে, আপদ বিদেয় হোক।

মুন্নি ঝাঁট দিচ্ছিল। পেছন ফিরে বলে—তিনটে তো মাত্তর টাকা, দিয়ে দিলে কম্বল কোত্থেকে আসবে শুনি? পৌষ-মাঘ মাসের রাতে ক্ষেতে কী করে কাটাবে? গিয়ে ওকে বলে দাও, ফসল উঠলে চুকিয়ে দেব। এখন নেই।

হল্‌কু কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পৌষ মাস মাথার ওপর এসে গেছে। কম্বল ছাড়া রাতে মাচায় কিছুতেই সে শুতে পারবে না। কিন্তু পেয়াদা যে শুনবে না, চোটপাট করবে, গালাগালি দেবে। মরুক গে, শীতে না-হয় মরব, আপদটা তো এখন বিদেয় হবে। এই ভেবে সে তার মোটাসোটা গতরটা নিয়ে (যা তার নামটাকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছে।) বউয়ের কাছে গিয়ে খোশামোদ করে বলে—যা, এনে দে, ঝামেলা তো মিটুক। কম্বলের কিছু একটা উপায় করবই।

মুন্নি ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে—আর করেছ উপায়! শুনি তো একটু, কী উপায় করবে? কেউ খয়রাত দেবে নাকি কম্বল? জানি না আর কত বাকি আছে, এ যেন কিছুতেই শোধ হচ্ছে না। বলি, তুমি চাষবাস ছেড়ে দাও না কেন? মরে-মরে কাজ করবে, তারপর যেই ফসল উঠবে অমনি বাকি বকেয়া চুকাবে, ব্যস শেষ। ধার শোধ করতেই যেন আমাদের জন্ম। পেট ভরাতে মজুরি কর। চুলোয় যাক অমন চাষ-বাস। দেব না আমি টাকা—কিছুতেই দেব না।

হল্‌কু বিষণ্ণভাবে বলে—তাহলে গালাগালি খাব?

মুন্নি তড়পে ওঠে—গালাগালি দেবে কেন? এ কি ওর রাজত্ব নাকি?

কথাটা বলে ফেলেই ওর কোঁচকানো ভুরু শিথিল হয়ে পড়ে। হল্‌কুর ঐ কথাগুলোর রূঢ় সত্যতা যেন একটি হিংস্র পশুর মতো চোখ পাকিয়ে দেখতে থাকে। গিয়ে তাকের উপর থেকে টাকা ক'টা বের করে এনে সে হল্‌কুর হাতে তুলে দেয়। বলে—তুমি এবার চাষাবাদ ছেড়ে দাও। মজুরি করলে তবু শান্তিতে একখানা রুটি খেতে পাব। কারু ধমকানি তো শুনতে হবে না।

হল্‌কু টাকা ক'টা হাতে নিয়ে এমনভাবে বাইরে যায় যেন সে তার কলজেটাকেই ছিঁড়ে দিতে যাচ্ছে। মজুরির রোজগার থেকে একটা-একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে সে তিনটে টাকা জমিয়েছিল একটা কম্বল কিনবে বলে। সে টাকা ক'টাও আজ বেরিয়ে যাচ্ছে। এক-একটা পা ফেলছে আর মাথাটা যেন তার দৈন্যের ভারে নুয়ে-নুয়ে পড়ছে।

দুই

পৌষের অন্ধকার রাত। আকাশের তারাগুলোও যেন শীতে থরথর করে কাঁপছে। হল্‌কু ক্ষেতের একপাশে আখের পাতার ছাউনির নিচে বাঁশের মাচার উপর তার পুরনো মোটা সুতির চাদরখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে-পড়ে হিহি করে কাঁপছে। মাচার নিচে ওর সঙ্গী কুকুর জবরা মুখখানাকে পেটের মধ্যে গুঁজে শীতে কুঁ-কুঁ করে চলেছে। দুজনের কারোরই চোখে ঘুম নেই।

হাঁটুদুটোকে ঘাড়ের সঙ্গে চাপতে-চাপতে হল্‌কু বলে—কিরে জবরা, শীত করছে? বলেছিলাম না, বাড়িতে খড়ের উপর শুয়ে থাক, তা এখানে কী করতে এসেছিস? মর্‌ এবার ঠাণ্ডায়। আমি কী করব? ভেবেছিলি আমি বোধহয় হালুয়া-পুরি খেতে আসছি, তাই ছুটতে-ছুটতে আগে-আগে চলে এসেছিস? এখন কাঁদ বসে-বসে।

জবরা শুয়ে-শুয়ে লেজ নাড়ে আর তার কুঁ...কুঁ...শব্দটাকে দীর্ঘায়িত করে একটা হাই তুলে চুপ করে যায়। তার সারমেয়-বুদ্ধি বোধহয় মনে করে যে ও কুঁ...কুঁ...করছে বলে মনিবের ঘুম আসছে না।

হাত বের করে জবরার ঠাণ্ডা পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে হল্‌কু বলে—কাল থেকে আমার সঙ্গে আর আসিসনে। এলে ঠাণ্ডায় জমে যাবি। এই শালার পশ্চিমা বাতাস কী জানি কোত্থেকে বরফ বয়ে আনছে। দেখি উঠে আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। কোনোমতে রাতটা তো কাটবে। আট ছিলিম টানা তো শেষ। এই হল গে চাষবাসের মজা। আবার এক-একজন এমন ভাগ্যবানও আছেন যাঁদের কাছে শীত গেলে ভয়ে পালাবে। মোটা-মোটা সব লেপ, তোষক, কম্বল। সাধ্য কি যে শীত পাত্তা পাবে! বরাতের জোর আর কি! খেটে মরব আমরা, মজা লুটবে অন্যে!

হল্‌কু ওঠে। গর্ত থেকে খানিকটা আগুন বের করে কলকে সাজায়। জবরাও উঠে বসে। তামাক খেতে-খেতে হল্‌কু বলে—খাবি তামাক? শীত আর কমে কই। হ্যাঁ, একটু যা মনটাকেই বুঝ দেওয়া।

জবরা ওর মুখের পানে স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

হল্‌কু—আজ একটু শীত সয়ে নে। কাল আমি এখানটায় খড় বিছিয়ে দেব। খড়ের ভেতর ঢুকে শুয়ে থাকিস, তাহলে শীত লাগবে না।

থাবাদুটোকে হল্‌কুর হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে হল্‌কুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় জবরা। হল্‌কুর গালে ওর গরম নিঃশ্বাস লাগে।

তামাক খেয়ে হল্‌কু আবার শুয়ে পড়ে। এবার সংকল্প করে শোয় যে যত যাই হোক না কেন এবার ঘুমাবই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর বুকের ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। একবার এ-পাশ ফিরে শোয়, আবার ও-পাশ। কিন্তু শীত যেন পিশাচের মতো ওর বুকে চেপে বসে থাকে।

কিছুতেই আর থাকতে না-পেরে সে জবরাকে আস্তে করে তুলে কোলে টেনে নেয়। জবরার মাথাটাকে আস্তে-আস্তে চাপড়াতে থাকে। কুকুরটার গা থেকে না-জানি কেমন একটা দুর্গন্ধ আসে, তবু হল্‌কু তাকে কোলে জাপটে ধরে এমন আরাম পায় যা সে ইদানীং কয়েকমাস পায়নি। জবরা বোধহয় ভাবে এই বুঝি স্বর্গ। হল্‌কুর নিষ্পাপ মনে কুকুরটির প্রতি লেশমাত্র ঘৃণাও নেই। সে তার কোনও অভিন্নহৃদয় বন্ধু বা ভাইকেও এমনি আগ্রহের সঙ্গেই আলিঙ্গন করত। আজকের এই দৈন্যদশা তার মনকে মোটেই আহত করেনি।

এই অদ্ভুত মিত্রতা তার হৃদয়ের সমস্ত দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়ে হৃদয়ের প্রতিটি অণুকণাকে যেন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

হঠাৎ জবরা জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পায়। অন্তরঙ্গ এই আত্মীয়তা তার মনে এক নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে, যার কাছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটও তুচ্ছ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে ছাউনির বাইরে এসে ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে। হল্‌কু কয়েকবার চু-চু করে ডাকে। তবু সে তার কাছে ফিরে আসে না। ক্ষেতের চারপাশে ছুটে-ছুটে ডাকাডাকি করে চলে। কিছুক্ষণের জন্য এলেও তাড়াতাড়ি আবার ছুটে যায়। কর্তব্যভাবনা যেন ওর মনটাকে আকাঙ্ক্ষার মতোই উথালপাথাল করে তোলে।

তিন

আরো একটা ঘণ্টা কাটে। রাত যেন শীতকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে-দিয়ে আরো শাণিয়ে তোলে। হল্‌কু উঠে বসে হাঁটুদুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দু-হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা গুঁজে নেয়। তবুও শীত মানে না। মনে হচ্ছে যেন সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ধমনীতে রক্তের বদলে বরফ বইছে। সে ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকায়—রাত আর কত বাকি! সপ্তর্ষিমণ্ডল এখনো যে আকাশের অর্ধেকটাও ওঠেনি। উপরে উঠে এলেই তবে গিয়ে ভোর হবে। এখনো প্রহরখানেক রাত রয়েছে।

হল্‌কুর ক্ষেত থেকে একটু দূরে আমবাগান। পাতাঝরা শুরু হয়ে গেছে। বাগানে রাশি-রাশি শুকনো পাতা। হল্‌কু ভাবে ওদিকে গিয়ে পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলে বেশ করে আগুন পোহায়। এত রাতে কেউ পাতা কুড়োতে দেখলে ভাববে ভূত। কে জানে কোনো জানোয়ার-টানোয়ার কোথাও লুকিয়ে বসে আছে কিনা; কিন্তু আর যে বসে থাকা যাচ্ছে না।

পাশের অড়হর ক্ষেতে গিয়ে কয়েকটা গাছ উপড়ে নিয়ে, তা দিয়ে একটা ঝাড়ুর মতো বানিয়ে হাতে ঘুঁটে জ্বালিয়ে নিয়ে সে বাগানের দিকে যায়। জবরা তাকে দেখে কাছে এসে লেজ নাড়ে।

হল্‌কু বলে, আর যে থাকতে পারছি না রে জবরু! চল্‌, বাগানে পাতা কুড়িয়ে আগুন পোহাই। গা গরম করে নিয়ে এসে শোব। এখনো অনেক রাত। জবরা কুঁ-কুঁ করে সম্মতি জানিয়ে সামনের বাগানের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বাগানে। অন্ধকারে দুরন্ত হাওয়া পাতাগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে যায়। গাছ থেকে শিশিরবিন্দু টুপটুপ করে নিচে ঝরে-ঝরে পড়ে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া মেহেদি ফুলের গন্ধ বয়ে আনে।

হল্‌কু বলে—কী মিষ্টি গন্ধ রে জবরু! তুইও নাকে সুগন্ধ পাচ্ছিস তো?

জবরা মাটিতে পড়ে থাকা এক টুকরো হাড় খুঁজে পায়, দাঁত দিয়ে সেটাকে চিবোতে শুরু করে।

মাটিতে আগুনটাকে রেখে হল্‌কু পাতা জড়ো করতে লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে একরাশ পাতা জমে ওঠে। ঠাণ্ডায় ওর হাত দুখানা কাঁপে। খালি পা দুটো যেন অবশ হয়ে পড়ে। পাতার পাহাড় সে খাড়া করেছে। শীতকে এই আগুনের কুণ্ডে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে সে।

খানিক বাদেই আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা উপরের গাছের পাতাগুলোকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়। সেই চঞ্চল আলোয় বাগানের বিরাট-বিরাট গাছগুলোকে মনে হয় অথৈ

আঁধারকে কারা যেন মাথায় তুলে রেখেছে। অন্ধকারের এই সাগরে এই আলোটা যেন একখানা নৌকোর মতো হেলতে-দুলতে থাকে।

হল্‌কু আগুনের সামনে বসে ওম পোহায়। একটু পরেই গায়ের চাদর খুলে সে বগলদাবা করে রাখে। পা দুখানা মেলে দেয়, ভাবখানা যেন শীতকে ডেকে বলছে—'দেখি কর্‌, তোর যা খুশি।' শীতের অসীম ক্ষমতাকে হারিয়ে দেয়ার বিজয়গর্বকে সে হৃদয়ে চেপে রাখতে পারছে না।

জবরাকে বলে, 'কী রে, আর শীত লাগছে-না তো?'

জবরা কুঁ-কুঁ করে যেন বলে—এখন কী করে আর শীত লাগবে?

'আগে থাকতে কথাটা মনে আসেনি। নইলে কি আর শীতে এত ভুগতাম।'

জবরা লেজ নাড়ে।

'বেশ বাবা, এস তো দেখি এই আগুনটাকে টপকে পার হই। দেখি কে যেতে পারে? পুড়েটুড়ে গেলে বাবা, আমি কিন্তু ওষুধ দেব না।'

অগ্নিকুণ্ডটার দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে দেখে জবরা।

'মুন্নিকে কাল আবার বলে দিও-না যেন তাহলে ঝগড়া করবে।' বলে সে লাফ দিয়ে আগুনটার উপর দিয়ে টপকে যায়। পায়ে একটুখানি আঁচ লাগে বটে, তবে তা তেমন কিছু নয়। জবরা আগুনের পাশ দিয়ে ঘুরে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হল্‌কু বলে—'উহুঁ, এটা ঠিক হচ্ছে না। উপর দিয়ে টপকে এস', বলে সে আবার লাফ দিয়ে আগুনের এ-পাশে চলে আসে।

চার

পাতা সব পুড়ে ছাই। বাগানে অন্ধকার আবার ছড়িয়ে পড়ে। ছাইয়ের নিচে কিছু-কিছু আগুন রয়েছে, যা বাতাসের ঝাপটা এলে একটুখানি জ্বলে উঠে পরক্ষণেই আবার নিভে যায়।

হল্‌কু আবার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গরম ছাইয়ের পাশে বসে গুনগুন করে একটা গান ধরে। গা-টা ওর গরম হয়েছে বটে, কিন্তু আস্তে-আস্তে আবার শীত যত বাড়ে ওকে তত আলসেমিতে পেয়ে বসে।

জোরে ঘেউ-ঘেউ করে ক্ষেতের দিকে জবরা ছুটে যায়। হল্‌কুর যেন মনে হয় একপাল জানোয়ার ওর ক্ষেতে এসে ঢুকেছে। বোধহয় নীলগাইয়ের পাল। ওদের দাপাদাপি, ছুটোছুটির আওয়াজও পরিষ্কার হল্‌কুর কানে আসে। ওরা বোধহয় ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলছে। ওদের চিবানোর চড়চড় আওয়াজও শোনা যায়। হল্‌কু মনে মনে বলে—নাহ্‌ জবরা থাকতে কোনো জানোয়ারের সাধ্যি নেই ক্ষেতে ঢুকবে। ও ছিঁড়েই ফেলবে। এ আমার মনের ভুল। কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না! আমিও কী যে ভুল শুনি!

জোর হাঁক পাড়ে সে—জবরা, জবরা!

জবরা ঘেউ-ঘেউ করে চলে। হল্‌কুর ডাক শুনে কাছে আসে না।

আবার ক্ষেতের ফসল খাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। এবারে নিজের মনকে সে আর ধোঁকা দিতে পারে না। কিন্তু জায়গা ছেড়ে ওঠা যেন বিষের মতো লাগে। বেশ জুত করে গরম হয়ে বসেছিল। এই কনকনে শীতে ক্ষেতে যাওয়া, জানোয়ারগুলোর পেছনে ছুটোছুটি করা অসহ্য মনে হচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে সে একটুও নড়ে না।

জোরে হাঁক দিয়ে ওঠে সে—হিলো! হিলো!! হিলো!!!

জবরা আবার ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে। জানোয়ারগুলো ক্ষেতটাকে শেষ করে ফেলছে। ফসল পেকে উঠেছে। এবার কী সুন্দর ফসল হয়েছিল! কিন্তু নচ্ছার এই জানোয়ারগুলো যে সব বরবাদ করে ফেলছে।

দৃঢ় সংকল্প করে হল্‌কু উঠে দাঁড়ায়। দু'তিন পা এগিয়েও যায়; কিন্তু আচমকা একটা ঠাণ্ডা, ছুঁচ বেঁধানো, বিছের হুলের মতো বাতাসের ঝাপটা এসে ওর গায়ে লাগতেই ও আবার নিভু-নিভু আগুনের কাছটাতে ফিরে এসে বসে পড়ে। ছাইগুলোকে খুঁচিয়ে দিয়ে গরম করতে বসে ঠাণ্ডা গা-টাকে।

ওদিকে গলা ফাটিয়ে ফেলছে জবরা। নীলগাইগুলো ক্ষেতটাকে শেষ করে ফেলছে। এদিকে হল্‌কু গরম ছাইয়ের পাশে শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে। অকর্মণ্যতা যেন দড়ির বাঁধনের মতো তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

ছাইয়ের পাশে গরম মাটির উপর চাদরমুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

সকালে ওর ঘুম ভাঙলে দেখে চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। মুন্নি ডেকে বলছে—আজ কি তুমি শুয়েই থাকবে গো? এখানে এসে আরাম করে তুমি ঘুমিয়ে রয়েছ আর ওদিকে সারাটা ক্ষেত যে হতচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হল্‌কু উঠে বলে—তুই কি ক্ষেত হয়ে আসছিস নাকি?

মুন্নি বলে—হ্যাঁ, সারাটা ক্ষেত ছারখার হয়ে গেছে। আরে, এমন করেও কেউ ঘুমোয় গো? তোমার তাহলে এখানে টং বানিয়ে কী লাভটা হল?

হল্‌কু ছুতো দেখায়—মরতে-মরতে যে আমি কোনোমতে বেঁচেছি সেই যথেষ্ট। আর তুই আছিস তোর ক্ষেতের চিন্তা নিয়ে। পেটে আমার সে যে কী যন্ত্রণা, এমন অসহ্য যন্ত্রণা যা কেবল আমিই টের পেয়েছি।

দুজনে ক্ষেতের আলে এসে দাঁড়ায়। দেখে, সারাটা ক্ষেত তছনছ হয়ে গেছে, জবরা মাচার নিচে চিত হয়ে শুয়ে, যেন তার ধড়ে প্রাণ নেই।

দুজনেই ক্ষেতের হাল দেখে। মুন্নির মুখে বেদনার ছায়া, হল্‌কু কিন্তু খুশি।

চিন্তিত হয়ে মুন্নি বলে—এবার মজুরি করে জমির খাজনা শুধতে হবে।

খুশিমনে বলে হল্‌কু—রাতে শীতে তো আর এখানে শুতে হবে না।

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

কৃষণ চন্দর

যখন পেশোয়ার স্টেশন ছেড়ে আসি তখন আমি তৃপ্তিতে একদলা ধোঁয়া উগরে দিয়েছিলাম। আমার খোপে-খোপে ছিল সব হিন্দু আর শিখ শরণার্থীরা। তারা এসেছিল পেশোয়ার, হাটমর্দন, কোহাট, চরসরা, খাইবার, লাণ্ডি কোটাল, বানু, নওশেরা, মানশেরা—সীমান্ত প্রদেশের এইসব জায়গা থেকে। স্টেশনটা খুব সুরক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর অফিসারেরাও খুব সজাগ ও দক্ষ। তবে, যতক্ষণ-না সেই রোমান্টিক পঞ্চনদীর দেশের দিকে আমি রওনা দিলাম, তারা অস্বস্তিতেই ভুগছিল। অন্য আর পাঁচজন পাঠানদের থেকে অবশ্য এই শরণার্থীদের তফাত করা যাচ্ছিল না। তাদের চেহারা বেশ লম্বা ও সুদর্শন, শক্ত গড়নের হাত-পা, পরনে কুল্লা ও লুঙ্গি, কারো-বা শালোয়ার; তাদের ভাষা গাঁয়ের পুশতু। প্রত্যেক খোপে দুজন করে বালুচি সেপাই খাড়া পাহারায় ছিল। রাইফেল হাতে ওরা একটু করে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছিল হিন্দু-পাঠান ও তাদের বৌ-বাচ্চাদের দিকে, যারা তাদের হাজার-হাজার বছরের বসবাসের ভূমি ছেড়ে পালাচ্ছে। এই পাহাড়ি জমি তাদের শক্তি জুগিয়েছে, তার তুষার-ঝরনা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, এবং এই ভূমির রোদ-ঝলমল বাগান থেকে তোলা মিষ্টি আঙুরের স্বাদে ভরে গেছে তাদের প্রাণ। হঠাৎ একদিন এই দেশ-গাঁ তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল; শরণার্থীরা, সম্ভবত অনিচ্ছুকভাবেই পাড়ি দিল গরম ক্রান্তিদেশীয় সমভূমির এক নতুন দেশে। ঈশ্বরের কাছে তারা কৃতজ্ঞ যে তাদের প্রাণ, ধনসম্পত্তি ও মেয়েদের ইজ্জত কোনোরকমে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু রাগে ও দুঃখে হৃদয়ে তাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছিল যেন, আর তাদের চোখ যেন সাতপুরুষের ভিটের ঐ গ্র্যানাইট বুকের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চলে গিয়ে অভিযোগে প্রশ্ন তুলেছিল : 'মা, মাগো, নিজের সন্তানদের কেন এভাবে ফিরিয়ে দিলে? কেন তোমার বুকের উষ্ণ আশ্রয় থেকে নিজের মেয়েদের বঞ্চিত করলে? এইসব নিষ্পাপ কুমারীরা, যারা তোমার অঙ্গে আঙুরলতার মতো জড়িয়ে ছিল, কেন হঠাৎ তাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে? মা, মাগো, কেন মা?'

উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমি দ্রুত ছুটছিলাম, আর আমার গাড়িগুলোর মধ্য থেকে এই ক্যারাভানের দল সতৃষ্ণ বিষণ্ন চোখ মেলে দেখে নিচ্ছিল বিলীয়মান মালভূমি, ছোট-বড় উপত্যকা ও তিরতির করে বয়ে-যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোটো নদী। ঝাপসা চোখের জলে শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছে যেন। প্রতিটি কোণা-খাঁজে যেন ওদের চোখ সেঁটে যাচ্ছে, চলে যাবার সময়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবে যেন; আমারও কেমন মনে হল আমার চাকাগুলো বোধহয় ভারি হয়ে উঠেছে, দুঃখে ও লজ্জায় যেন আটকে যাচ্ছে তারা, আর যেন ছুটবার শক্তি নেই আমার, আমি বোধহয় থেমেই পড়ব এবার।

হাসান আবদাল স্টেশনে আরো শরণার্থীরা এল। ওরা শিখ, পাঞ্জা সাহেব থেকে আসছে, সঙ্গে লম্বা কৃপাণ, ভয়ে মুখ ওদের পাঁশুটে; বড়-বড় ডাগর চোখের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত যেন এক নাম-না-জানা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। ওরা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার খোপে ঢুকে পড়ল। একজনের ঘর-বাড়ি সব গেছে, আরেকজনকে পালিয়ে আসতে হয়েছে পরনের শালোয়ার-কামিজ মাত্র সম্বল করে; আর একজনের পায়ে কোনো জুতো নেই; ওই কোণার লোকটি এতটাই ভাগ্যবান যে সে তার সবকিছুই নিয়ে আসতে পেরেছে, মায় তার ভাঙা কাঠের তক্তপোশটা পর্যন্ত! যার সবকিছু গেছে সে বসে আছে শান্ত, চুপচাপ, গুম হয়ে, অন্যজন যে কিনা সারাজীবনে একটা পিঠের টুকরোও জোটাতে পারেনি সে-ও তার হারানো লাখ টাকার গল্প বলছে, আর নেড়েদের শাপশাপান্ত করছে। বালুচিসেনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে।

তক্ষশিলায় আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। আমার গার্ডসাহেব স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আশপাশের গ্রাম থেকে একদল হিন্দু শরণার্থী আসছে। তাদের জন্য এই ট্রেনটাকে অপেক্ষা করতেই হবে।' এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমার গাড়ির মধ্যেকার লোকজনেরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি খুলল এবং পালিয়ে আসার সময়ে যৎসামান্য যে যা আনতে পেরেছিল তাই খেতে আরম্ভ করল। বাচ্চারা হৈ-হল্লা করছিল আর তরুণী মেয়েরা শান্ত গভীর চোখে তাকিয়েছিল জানলার বাইরের দিকে। হঠাৎ দূরে ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠ এদিকেই আসছে। জাঠ আরো কাছে এগিয়ে এল, স্লোগান দিতে-দিতে। আরো কিছু সময় কাটল। এবারে দলটা স্টেশনের একেবারে কাছে এসে পড়ল। ঢাকের আওয়াজ আরো জোর হল আর একঝাঁক গুলিগোলার আওয়াজ এল কানে। তরুণী মেয়েরা ভয়ে জানলা থেকে সরে গেল। এই দলটা ছিল হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠ—প্রতিবেশী মুসলমানদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যাদের নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের কাঁধের উপরে ঝোলানো রয়েছে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা এক-একজন কাফেরের মৃতদেহ। এ-রকম মৃতদেহের সংখ্যা দুশো, অত্যন্ত নিরাপদে তাদের স্টেশনে এনে বালুচি রক্ষকদের হাতে দিয়ে দেয়া হল। মুসলমান জনতা চাপ দিল যে, এই মৃত হিন্দু শরণার্থীদের যথোচিত সম্মানের সঙ্গে হিন্দুস্তানের গেট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বালুচি সৈন্যরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিল তাদের তারপর প্রত্যেক গাড়ির মধ্যিখানে কয়েকটা করে মৃতদেহ রেখে দিল। এরপর মুসলমান জনতা আকাশের দিকে তাক করে গুলির আওয়াজ করল ও স্টেশনমাস্টারকে আদেশ দিল আমাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে দেবার জন্য। আমি সবেমাত্র চলতে শুরু করেছি এমন সময়ে কে একজন চেন টেনে আমাকে থামিয়ে ফেলল। তারপর মুসলমান জনতার দলপতি একটা গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন যে, ঐ দুশোজন শরণার্থী চলে যাওয়ায় তাঁদের গ্রাম যেহেতু গোল্লায় যাবে, তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রেন থেকে দুশোজন হিন্দু ও শিখ নামিয়ে নিতে হবে; যাই হোক-না কেন, দেশের জনশক্তির ক্ষতিপূরণ করতেই হবে। বালুচি সৈন্যরা দেশপ্রেমের জন্য উচ্চকণ্ঠে তাঁদের জয়গান করল, এবং বিভিন্ন বগি থেকে দুশোজন শরণার্থীকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে তুলে দিল।

'সব কাফেররা সার দিয়ে দাঁড়াও!' ওদের নেতা হুঙ্কার দিল; ঐ নেতাটি আশপাশের গ্রামের এক শাঁসালো সামন্তপ্রভু। শরণার্থীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল, মরে জমে

গেছে যেন। জনতা কোনোমতে ওদের একটা সারি করে দাঁড় করিয়ে দিল। দুশো লোক... দুশো জীবন্ত মৃতদেহ...নগ্ন...ভয়ে মুখগুলো সব নীল....চোখের তারায় বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে রক্তলোলুপ তীর....

বালুচি সৈন্যরাই শুরু করল।

পনের জন শরণার্থী টলমল পায়ে শ্বাস টানতে-টানতে মরে পড়ে গেল।

এই জায়গাটা ছিল তক্ষশিলা।

আরো কুড়িজন পড়ল।

এখানেই ছিল এশিয়ার মহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে হাজার-হাজার বছর ধরে লক্ষ-লক্ষ ছাত্ররা মানুষের সভ্যতা বিষয়ে তাদের প্রথম পাঠ নিয়েছে।

আরো পঞ্চাশজন মুখ থুবড়ে পড়ল মরে।

তক্ষশিলার জাদুঘরে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি ছিল, অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের গর্বের সভ্যতার ছোটো-ছোটো উজ্জ্বল সব দীপশিখা।

তবুও আরো পঞ্চাশটি প্রাণ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

এ-সবের প্রেক্ষাপটে ছিল সিরকপের রাজপ্রাসাদ, খেলাধুলার জন্য এক বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটার আর তারো পেছনে অনেক মাইল জুড়ে একটা গৌরবান্বিত ও মহান এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আরো তিরিশজন মৃত।

এখানে রাজত্ব করতেন কণিষ্ক। ওঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর এক সাধারণ ভ্রাতৃত্বের বোধ।

তারা আরো কুড়িজনকে মেরে ফেলল।

এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের সেই মহান সংগীতের গুঞ্জন শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানেই ভেবেছিলেন প্রেমের আর সত্যের আর সৌন্দর্যের কথা আর এক নতুন ধাঁচের জীবনের কথা।

এবং এখন সেই দুশো জনের শেষ কয়েকজন মাত্র তাদের অন্তিম লগ্নের জন্য অপেক্ষা করেছে।

ইসলামের বাঁকা চাঁদ প্রথম এখানকার দিগন্তেই তার আলো দিয়েছিল, সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের ও মানবিকতার প্রতীক...

সবাই এখন মৃত। আল্লা-হু-আকবর!

প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে গেল, এবং এত কাণ্ডের পরে যখন আমি আবার রওনা দিলাম আমার মনে হল যে, এমনকি আমার নিচেকার লোহার চাকাগুলো পর্যন্ত যেন পিছলে-পিছলে যাচ্ছে।

মৃত্যু স্পর্শ করেছে আমার সবকটা গাড়িকেই। মৃতদের শোয়ানো হয়েছিল মাঝখানে, আর চারপাশ ঘিরে জীবন্ত মৃতেরা। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল; কোনো-এক কোণে কারো মা ফোঁপাতে লাগলেন; এক স্ত্রী তার মৃত স্বামীর দেহ আঁকড়ে ছিল। আমি দৌড় লাগালাম ভয়ে আর ত্রাসে এবং রাওয়ালপিণ্ডি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

এখানে আমাদের জন্য কোনো শরণার্থী অপেক্ষা করছিল না। কেবল জনাকুড়ি পর্দানশীন মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে কয়েকজন মুসলমান যুবক আমার একটা গাড়ির

মধ্যে ঢুকে পড়ল। যুবকদের সঙ্গে ছিল রাইফেল, তারা সঙ্গে করে অনেক বাক্স গোলাবারুদও এনেছিল। তারা আমাকে ঝিলম ও গুজর খাঁর মাঝখানে থামিয়ে নিজেরা নামতে লাগল। হঠাৎ সঙ্গের মহিলারা তাদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করল, 'আমরা হিন্দু, আমরা শিখ, ওরা জোর করে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।' যুবকেরা হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, ওদের আরামের ঘর থেকে জোর করেই ওদের এনেছি', যুবকেরা বলল। 'ওরা তো আমাদের লুঠের ধন। সে রকমই সদ্ব্যবহার করা হবে এদের। কে বাধা দেয় দেখি?'

দুজন হিন্দু পাঠান ওদের উদ্ধারের জন্য লাফ দিল। বালুচি সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় ওদের শেষ করে দিল। তবু আরো কয়েকজন চেষ্টা করল। তাদেরও কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম করা হল। তারপর ঐ তরুণী মেয়েদের টানতে-টানতে কাছে এক বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, আর আমি কালো ধোঁয়ায় নিজের মুখ আড়াল করলাম এবং দৌড়ে পালিয়ে গেলাম ঐ জায়গা থেকে। মনে হল আমার লোহার ফুসফুস বোধহয় ফেটে যাবে, আর আমার মধ্যেকার লাল গনগনে আগুনের শিখা যেন গিলে ফেলবে এই বিরাট ঘন অরণ্যকে, যা আমাদের লজ্জার সাক্ষী হয়ে রইল।

আমি লালা মুসার কাছাকাছি আসতে-আসতে মৃতদেহের দুর্গন্ধ এতটাই বাড়তে থাকল যে, বালুচি সৈন্যরা সিদ্ধান্ত নিল, ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। ফেলে দেবার পদ্ধতিটাও চটপট বানিয়ে ফেলল তারা। যাদের মুখটা দেখতে ওদের পছন্দ হচ্ছে না এ-রকম একজনকে আদেশ করা হবে একটা মৃতদেহ গাড়ির দরজার কাছে আনতে, আর তারপরে সে দরজার কাছে এলে মৃতদেহসুদ্ধ তাকে ফেলে দেয়া হবে।

লালা মুসা থেকে আমি এলাম ওয়াজিরাবাদে। ওয়াজিরাবাদ হল পাঞ্জাবের এক অতি পরিচিত শহর। সারা ভারতের হিন্দুরা ও মুসলমানেরা যে ছুরি-ছোরা দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করে তা এই ওয়াজিরাবাদ থেকেই রপ্তানি করা হয়। ওয়াজিরাবাদ অবশ্য খুব বড় বৈশাখী উৎসবের জন্যও বিখ্যাত। এই বৈশাখীতে হিন্দু-মুসলমানেরা নবান্নের উৎসবে মিলিত হন। তবে, আমি যখন ওয়াজিরাবাদে পৌছলাম তখন সেখানে দেখলাম শুধু শবদেহের মেলা। অনেক দূরে, ধোঁয়ার এক ঘন আস্তরণ শহরের উপরে ছেয়ে ছিল আর স্টেশনের কাছে শোনা যাচ্ছিল কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি, উচ্চকিত হাসির রোল আর মত্ত জনতার উদ্দাম করতালি। এ নিশ্চয়ই বৈশাখী উৎসব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনতার ভিড় প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এল, একদল উলঙ্গ স্ত্রীলোককে ঘিরে নাচতে-নাচতে ও গান গাইতে গাইতে। হ্যাঁ, তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধা ও তরুণী, ছিল বাচ্চারা, নগ্নতা নিয়ে যাদের কোনো ভয় নেই। ছিলেন দিদিমা ও নাতনি, ছিলেন মায়েরা ও বোনেরা আর মেয়েরা ও স্ত্রীরা, এবং কুমারীরা; এবং ওঁদের চারপাশ ঘিরে ঐ পুরুষেরা নাচছে ও গাইছে। মেয়েরা সব হিন্দু শিখ আর পুরুষেরা মুসলমান এবং তিন সম্প্রদায় মিলেই যেন এক বিচিত্র বৈশাখী উৎসব পালনের জন্য তারা মিলিত হয়েছে। মেয়েরা সোজা হয়ে হেঁটে চলল। তাদের চুল অবিন্যস্ত, শরীর বেইজ্জতে উলঙ্গ, কিন্তু তবুও তারা সোজা হয়ে সগর্বে হেঁটে চলল যেন হাজার শাড়িতে তাদের শরীর জড়ানো, যেন কালো করুণামেদুর মৃত্যুর ঘন ছায়ায় তাদের আত্মা আবৃত। তাদের চোখে নেই কোনো ঘৃণার প্রকাশ। লক্ষ-লক্ষ সীতার অকলঙ্ক অহংকারে তাদের চোখ জ্বলছে।

তাদের চারপাশ ঘিরে ঐ জনতার ঢেউয়ের চিৎকার ধ্বনি, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ইসলাম জিন্দাবাদ!! কয়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ! ! !'

নাচ-গানের এই হল্লা ছাপিয়ে বিচিত্র শোভাযাত্রা এখন সরাসরি গাড়ির মধ্যে জড়ো করা ঐ শরণার্থীদের ঠিক চোখের সামনে। মেয়েরা নিচু হয়ে আঁচলে তাদের মুখ লুকাল আর পুরুষেরা গাড়ির জানালা বন্ধ করতে লাগল।

'জানালা বন্ধ কর না!' বালুচিরা গর্জে উঠল। 'টাটকা হাওয়া ঢুকতে দাও।'

কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না। জানালাগুলো ওরা বন্ধ করে চলল।

সৈন্যরা গুলি চালাল। কয়েকজন শরণার্থী মরে পড়ে গেল; অন্যেরা তাদের জায়গা নিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আর কোনো জানালাই বন্ধ রইল না।

ঐ উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের বলা হল আমার ভেতরে উঠতে আর শরণার্থীদের মধ্যে বসে পড়তে, আর তারপর তারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ', ও 'কয়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ' চারপাশের এইসব মত্ত ধ্বনির মধ্যে আমাকে সহৃদয় বিদায় জানাল।

রোগা টিংটিঙে একটা ছোট বাচ্চা আস্তে-আস্তে একজন বৃদ্ধা নগ্ন স্ত্রীলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি কি এইমাত্র স্নান করেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা, আজ আমার দেশের ছেলেরা, আমার নিজের ভাইয়েরা আমাকে স্নান করিয়েছে।'

'তাহলে, তোমার জামা-কাপড় কই, মা?'

'আমার বৈধব্যের রক্তে ওই কাপড়ে দাগ লেগেছিল, বাবা! তাই আমার ভাইয়েরা সে-কাপড় নিয়ে নিয়েছে।'

আমি যখন দৌড়ুচ্ছি তখন দুই উলঙ্গ তরুণী আমার গাড়ির দরজা দিয়ে লাফ দিল, ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি এবং রাত্রির মধ্যে দৌড়ে পালাতে লাগলাম যতক্ষণ-না লাহোর পৌঁছাই।

লাহোরে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামলাম। আমার ঠিক উল্টোদিকে দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল অমৃতসর থেকে আসা একটা ট্রেন, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান শরণার্থীদের বয়ে এনেছে সেটা। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমান রক্ষীরা আমার গাড়িগুলোর শরণার্থীদের মধ্যে তল্লাশ চালাল। সমস্ত টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি ও অন্যান্য মূল্যবান যা-কিছু ছিল তারা সব নিয়ে গেল। তারপর ওরা চারশ শরণার্থীকে নির্বাচন করল বদলা হত্যার জন্য। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম : মুসলমান শরণার্থী বয়ে-আনা ঐ অমৃতসরের ট্রেনটাকে পথে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং চারশ মুসলমান খুন ও পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক লুট করা হয়েছিল। কাজেই এটাই তো উচিত যে ঠিক চারশ হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে হত্যা করতে হবে এবং পঞ্চাশজন হিন্দু ও শিখ রমণীর ইজ্জত নষ্ট করা হবে, যাতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

মোগলপুরাতে রক্ষী বদল হল। বালুচিরা বদলে গিয়ে তাদের জায়গাতে এল শিখ, রাজপুত ও ডোগরারা। আতারি থেকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা মুসলমান শরণার্থীদের এত মৃতদেহ এখন দেখতে পাচ্ছে যে, সন্দেহ নেই, তারা স্বাধীন ভারতের সীমান্তের খুব কাছে এসে গেছে।

অমৃতসর থেকে চারজন ব্রাহ্মণ আমার মধ্যে উঠল। হরিদ্বারে যাচ্ছিল তারা। তাদের মাথা পরিষ্কার করে কামানো, ঠিক মাঝখানে লম্বা শিখা। কপালে তাদের তিলক কাটা,

রামনাম ছাপা ধুতি পরে তারা তীর্থে বেরিয়েছে। অমৃতসর থেকে বন্দুক, বর্শা ও কৃপাণ হাতে দলে-দলে হিন্দু শিখেরা পূর্ব পাঞ্জাবে যাওয়া সমস্ত ট্রেনে চড়ে বসল। এরা বেরিয়েছে 'শিকার'-এর খোঁজে। ঐ ব্রাহ্মণদের দেখে ঐ শিকারিদের একজনের সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রাহ্মণ দেবতা, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'হরিদ্বারে।'

'হরিদ্বারে, না পাকিস্তানে?' সে মশকরার সুরে জিজ্ঞেস করল।

'আল্লার নামে শপথ করে বলছি, আমরা হরিদ্বারে যাচ্ছি!'

ঐ জাঠ হেসে উঠল, 'আল্লার নামে, বেশ! তাহলে এবার কোতল করে ফেলা যাক।' সে তখন চিৎকার করে ডাকল, 'নাথা সিং, এদিকে এস, বড়ো শিকার মিলেছে!' ওরা একজনকে হত্যা করল । অন্য তিনজন 'ব্রাহ্মণ' পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের ধরে ফেলা হল। 'তোমরা তাহলে হরিদ্বারে যাচ্ছ', নাথা সিং চিৎকার করে উঠল, 'এস, হরিদ্বারে যাবার আগে তোমাদের ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।'

'ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ল ওরা ঠিক যা আশা করেছিল তা-ই—সুন্নত।

ডাক্তারি পরীক্ষার পরে হত্যা করা হল তিনজন ব্রাহ্মণকেও।

হঠাৎ এক ঘন অরণ্যের ধারে থামানো হল আমাকে। সেখানে দু-এক মুহূর্তের মধ্যে আমি চিৎকার-ধ্বনি শুনলাম 'সৎ শ্রী আকাল' ও 'হর-হর মহাদেও' আর দেখতে পেলাম সৈন্যরা ও শিখ এবং হিন্দু শরণার্থীরা আমাকে ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ওরা পালিয়ে যাচ্ছে মুসলমান দস্যুর ভয়ে। পরে দেখলাম সে আমার ভুল। ওরা দৌড়ুচ্ছিল—নিজেদের বাঁচাতে নয়,—কয়েকশ গরিব মুসলমান চাষিকে হত্যা করতে, যারা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এ জঙ্গলে লুকিয়েছিল। আধ ঘন্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ। পরম আনন্দে বিজেতারা ফিরে আসছে। একজন জাঠ তার বর্শার ডগায় এক মুসলমান শিশুর শব দোলাতে-দোলাতে গান গাইছিল, 'আল বৈশাখী, এই বৈশাখী, হো হো!'

জলন্ধরের কাছে পাঠান বসতির একটা গ্রাম ছিল। এখানে আবার আমাকে চেন টেনে থামানো হল, আর সবাই নেমে আবার ধাওয়া করল ঐ গ্রামটার দিকে। পাঠানরা খুব সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল বটে, তবে আক্রমণকারীরা অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় অনেক বেশি জোরালো ছিল। গ্রামের পুরুষেরা সব এই যুদ্ধে প্রাণ দিল। তারপরে এল স্ত্রীলোকদের পালা। এখানে এই বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে, পিপলু, শীষম ও সারিনগাছের তলায়, কেড়ে নেয়া হল তাদের ইজ্জত। এই হল পাঞ্জাবের সেইসব মাঠ যেখানে চাষিরা—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ চাষিরা—একসঙ্গে মিলে সোনার শস্য ফলিয়েছে; যেখানে সরষের সবুজ পাতায় ও হলুদ ফুলে সমস্ত গ্রামাঞ্চল এক স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হত। এইসব পিপলু, শীষম ও সারিনগাছের নিচেই সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্বামীরা অপেক্ষা করত কখন তাদের প্রিয়তমা স্ত্রীরা লস্যি নিয়ে আসবে। ঐ তো, ঐ মাঠের পার দিয়ে, তারা লম্বা সার বেঁধে আসছে, হাতের ঘড়ার মধ্যে লস্যি আর বয়ে আনছে মধু, মাখন আর সোনালি গমের চাপাটি। কী সতৃষ্ণ চোখে কিষাণেরা চেয়ে থাকত কিষাণী বধূর দিকে, আর ঐ চোখের চাহনিতে বউরাও কেঁপে-কেঁপে উঠত নরম পাতার মতো। এই তো পাঞ্জাবের বুকের কলজে। এখানেই জন্মেছিল সোনি আর মাহিওয়াল, হীর ও রঞ্জা! আর এখন! পঞ্চাশটা নেকড়ে, পঞ্চাশজন সোনি আর পাঁচশো মাহিওয়াল। এ-পৃথিবী আর-কখনোই

আগের মতো হবে না। চেনাব আর কখনো তেমন তিরতির করে বয়ে যাবে না। হীর, রঞ্জা, সোনি, মাহিওয়াল ও মীর্জা সাহেবানের গান আর কখনো এই বুকে ঠিক তেমন করে গুঞ্জন তুলবে না। লক্ষ-লক্ষ অভিশাপ নেমে আসুক সেইসব নেতাদের মাথায় আর তাদের সাত-সাতে উনপঞ্চাশ পুরুষের মাথায় যারা এই সৌন্দর্য, বীরধর্ম ও মর্যাদাময় ভূখণ্ডকে অসম্মান, প্রতারণা ও হত্যার ছেঁড়াখোড়া টুকরোয় দাঁড় করিয়েছে, যারা এর আত্মায় সিফিলিসের বিষ ঢুকিয়েছে আর এর শরীরে ভরে দিয়েছে হত্যা, লুঠতরাজ ও ধর্ষণের জীবাণু। পাঞ্জাব আজ মরে গেছে। এর সংস্কৃতি মরে গেছে। এর ভাষা মরে গেছে। মরে গেছে এর সংগীত। এর সাহসী, সদাচারী, নিষ্পাপ প্রাণ মরে গেছে। আমার যদিও চোখ ও কান কিছুই নেই, তবু আমি এই মৃত্যু দেখতেও পেলাম, শুনতেও পেলাম।

শরণার্থীরা ও সৈন্যরা পাঠান নারী-পুরুষদের মৃতদেহ বহন করে ফিরে এল। আবার কয়েক মাইল আসার পরে একটা খাল পাওয়া গেল, এখানে আমাকে আবার থামানো হল। এই খালে শবদেহগুলোকে জড় করে ফেলা হল, এবং তারপর আমি আবার এগোলাম। যাত্রীরা সকলেই এখন ভীষণ খুশি! রক্ত ও ঘৃণার স্বাদ তারা পেয়েছে, এবং এখন দেশি মদের বোতল খুলে তারা ফূর্তি করতে লাগল।

আবার আমরা থামলাম লুধিয়ানায়। এখানে লুটেরারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ও মুসলমান মহল্লা ও দোকানগুলোকে আক্রমণ করল। ঘণ্টাদুয়েক বাদে তারা স্টেশনে ফিরে এল। সমস্ত পথ জুড়ে তাদের এই হত্যা ও লুঠ চলতেই থাকল। এবং এতক্ষণে আমার আত্মায় এত ক্ষত জমেছে এবং আমার কাঠের শরীরে রক্তের দাগে এত ময়লা পড়েছে যে, আমার ভীষণ রকমভাবে স্নানের দরকার, কিন্তু আমি জানি যে, পথের মধ্যে আমাকে সে-সুযোগ দেবে না!

অনেক রাত্রে আমি আম্বালা পৌঁছলাম। এখানে একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের সেনাবাহিনীর প্রহরায় এনে আমার একটা প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে তুলে দেয়া হল। সৈন্যদের ওপর কঠোর আদেশ রইল এই মুসলমান কর্মচারীর জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখবার।

রাত্রি দুটোয় আম্বালা ছাড়লাম। মাইলদশেকও বোধহয় আমি আসতে পারিনি এমন সময় কেউ আমার চেন টানল। মুসলমান কর্মচারী যে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে যাচ্ছিলেন তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কাজেই তারা জানলার কাচ ভাঙল। এখানে তারা ঐ মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ও তিনটি ছোট বাচ্চাকে খুন করল। ডেপুটি কমিশনারের একটি অল্পবয়সী মেয়ে ছিল। সে খুবই সুন্দরী; তাই তারা ওকে বাঁচিয়ে রাখবার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা মেয়েটিকে নিল, গয়নাগাটি ও ক্যাশবাক্স নিল, তারপর গাড়ি থেকে নেমে গেল জঙ্গলের দিকে। মেয়েটির হাতে একখানা বই ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে ওরা অধিবেশনে বসল। মেয়েটিকে নিয়ে কী করা হবে? ওকে খুন করা হবে, না বাঁচিয়ে রাখা হবে? মেয়েটি বলল, 'আমাকে খুন করবার দরকার কী? আমাকে তোমাদের ধর্মে বদল করে নাও। আমি তোমাদের একজনকে বিয়ে করব।'

'তাই তো, ঠিক কথা,' একজন তরুণ বলল, 'আমার মনে হয় ওকে আমাদের...'

আর-একজন তরুণ তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটির পেটে একটা ছোরা বসিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ওকে এখানেই খতম করে দেয়া উচিত। চল, ফেরা যাক। এ-সব গোলটেবিল বৈঠক ঢের হয়েছে।'

মেয়েটি মরে গেল, জঙ্গলের শুকনো ঘাসের উপরে আর ওর হাতের বইখানা ওরই রক্তের দাগে নোংরা হল। বইটা ছিল সমাজতন্ত্রের ওপর। হয়তো ও ছিল খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, হয়তো দেশের ও জাতির সেবায় কাজ করবার এক জ্বলন্ত বাসনা ওর ছিল। হয়তো ভালোবাসার জন্য ওর আত্মা যন্ত্রণায় দীর্ণ ছিল, হয়তো কারো ভালোবাসা পাবার জন্যও, আদরের আলিঙ্গনে মিলিত হবার জন্য, নিজের সন্তানকে চুমো দেবার জন্য। ও তো ছিল মেয়ে, কারো প্রিয়তমা, কারো জননী, সৃষ্টির অজানা রহস্য; আর এখন এই জঙ্গলে ও মরে পড়ে রইল, শেয়ালে ও শকুনে ওর শব খেয়ে যাবে। সমাজতন্ত্র, তত্ত্ব ও প্রয়োগ...জন্তুরা এখন ওসব খেয়ে ফেলছে।

রাত্রির হতাশ অন্ধকারের মধ্যে আমি এগিয়ে চললাম, দেশি মদে মাতাল কিছু লোককে আমার গাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে; তাদের গলায় চিৎকার, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়!'

অনেকদিন পরে আমি বোম্বাইতে এসেছি। এখানে ওরা আমাকে পরিষ্কার করেছে, ধুয়েছে এবং শেডের মধ্যে রেখেছে। আমার শরীরে এখন আর কোনো রক্তের দাগ নেই। খুনেদের রক্ত-জল-করা হাসির হুল্লোড় আর নেই। কিন্তু রাত্রে যখন আমি একলা থাকি, ভূতেরা সব জেগে ওঠে, মৃত আত্মারা যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়, আহতরা জোরে চিৎকার করে, নারীরা ও শিশুরা ভয়ে কঁকিয়ে ওঠে, আর আমি মনে-মনে কামনা করি ঐ ভয়ানক যাত্রায় আর যেন কেউ আমাকে নিয়ে না-যায়। ঐ ভয়ংকর যাত্রার জন্য আমি এই শেড আর কখনো ছাড়ব না। কিন্তু আমি অবশ্যই এই শেড ছেড়ে যাব দীর্ঘ ও সুন্দর যাত্রায় গাঁ-গঞ্জের মধ্য দিয়ে, যখন পাঞ্জাবের মাঠ আবার সোনার শস্যে ভরে উঠবে, যখন সরষে ফুল দেখে মনে হবে হীর ও রঞ্জা অনন্ত প্রেমের গান গাইছে, যখন চাষিরা, হিন্দু-মুসলমান ও শিখ, সবাই আবার একসঙ্গে চাষ করবে, বীজ বুনবে ও ফসল তুলবে, এবং যখন তাদের হৃদয় আবার কানায়-কানায় ভরে উঠবে প্রেমে ও পূজায় ও নারীর প্রতি সম্মানে।

আমি সামান্য একটা কাঠের ট্রেন, কিন্তু প্রতিশোধ ও ঘৃণার ঐরকম ভারি বোঝা কেউ আমার ঘাড়ে আবার চাপিয়ে দিক এ আর আমি কোনোমতে চাই না! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বওয়ানো হোক। শিল্পাঞ্চলের জন্য আমাকে দিয়ে কয়লা, লোহা ও তেল বওয়ানো হোক। গ্রামে আমাদের চাষিদের জন্য আমাকে দিয়ে সার ও ট্র্যাক্টর আনানো হোক। যেখানেই যাই-না কেন, সেখানে যেন আমাকে দিয়ে মৃত্যু ও ধ্বংস আর নিয়ে যাওয়া না-হয়। আমি চাই আমার গাড়ির খোপে-খোপে থাকুক সম্পন্ন চাষি ও শ্রমিকের দল ও তাদের সুখী বউ-বাচ্চারা, খুশিতে ভরপুর, পদ্মফুলের মতো হাসি তাদের মুখে; এইসব বাচ্চারাই তো এক নতুন জীবনের ধারা গড়ে তুলবে—যেখানে মানুষ হিন্দুও হবে না, মুসলমানও হবে না, হবে শুধু সেই আশ্চর্য সত্তা—মানুষ!!

জামগাছ

কৃষণ চন্দর

রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর লনের জামগাছটা উপড়ে পড়েছে সেই ঝড়ে। ভোরে মালি দেখতে পেল গাছটার নিচে একজন মানুষ চাপা পড়ে আছে।

মালি ছুটতে-ছুটতে চাপরাসির কাছে গেল—চাপরাসি ছুটতে-ছুটতে গেল ক্লার্কের কাছে—ক্লার্ক ছুটতে-ছুটতে গেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে।

সুপারিনটেনডেন্ট ছুটতে-ছুটতে বাইরে লনে এলেন। দেখলেন ঝড়ে উপড়েপড়া গাছের নিচে যে মানুষটি চাপা পড়ে আছে তার চারদিকে বেশ ভিড় জমেছে।

একজন ক্লার্ক আক্ষেপ করে বলল, 'আহা, এই জামগাছে কতই-না ফল ধরত।' আর-একজন ক্লার্ক তাকে মনে করিয়ে দিল, 'আর এর জাম কী রসেই-না ভরপুর ছিল।'

তৃতীয় ক্লার্কটি বলল, 'ফলের মরসুমে আমি ঝোলা ভর্তি করে এই ফল নিয়ে যেতাম। আর আমার বাচ্চারা কত আনন্দেই-না এই জাম খেত।'

মালি গাছের নিচে চাপাপড়া মানুষটির দিকে ইশারা করে বলল, 'আর এই মানুষ?'

'হ্যাঁ, এই মানুষ...।' সুপারিনটেনডেন্ট খুব চিন্তায় পড়লেন। একজন চাপরাসি জিজ্ঞেস করল, 'জানি না এ বেঁচে আছে, না মরে গেছে।'

অন্য একজন চাপরাসি বলল, 'বোধহয় মারা গেছে, এত বড় গাছ কোমরের উপর পড়লে কি মানুষ বাঁচতে পারে?'

গাছের নিচে চাপা-পড়া মানুষটি বেশ রুক্ষ স্বরেই বলল, 'না, আমি বেঁচে আছি।'

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আরে, বেঁচে আছে!'

মালি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলল, 'গাছটিকে সরিয়ে মানুষটিকে এর নিচ থেকে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।'

একজন ফাঁকিবাজ হৃষ্টপুষ্ট চাপরাসি ভারিক্কিচালে বলল, 'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। গাছের গুঁড়িটি বেশ ভারিই হবে।'

মালি জিজ্ঞেস করল, 'সোজা নয় কেন? সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব যদি হুকুম দেন, তবে আমরা পনের-বিশজন মালি-চাপরাসি আর ক্লার্ক মিলে গাছের নিচে থেকে মানুষটিকে অনায়াসে বের করে আনতে পারি।

বেশ কিছু ক্লার্ক মালিকে সমর্থন করে একসঙ্গে বলে উঠল, 'হাঁ, হাঁ, মালি ঠিক বলেছে। আমরা তৈরি, হাত লাগাও।'

অনেকে গাছটিকে সরানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুপারিনটেনডেন্ট হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, 'আমি আন্ডার সেক্রেটারির কাছে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।'

সুপারিনটেনডেন্ট আন্ডার সেক্রেটারির কাছে গেলেন। আন্ডার সেক্রেটারি গেলেন ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে। ডেপুটি সেক্রেটারি গেলেন জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে। জয়েন্ট সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারির কাছে গেলেন। চিফ সেক্রেটারি মিনিস্টারের কাছে। মিনিস্টার চিফ সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। চিফ সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। একইভাবে জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারিকে এবং ডেপুটি সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারিকে কিছু বললেন। ফাইল চলতে লাগল—এর মধ্যে পার হল অর্ধেক দিন।

দুপুরের লাঞ্চের পর সেই চাপা-পড়া মানুষের চারদিকে আরো ভিড় বেড়ে গেল। নানা মানুষ নানা ধরনের কথা বলতে লাগল। কয়েকজন বিজ্ঞ ক্লার্ক সমস্যার সমাধান বের করে ফেললে নিজেরাই। বিনা হুকুমেই তারা যখন গাছ সরানোর পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই সুপারিনটেনডেন্ট ফাইল নিয়ে ছুটতে-ছুটতে হাজির হলেন। বললেন, আমরা এই গাছ আমাদের খেয়াল-খুশি মতো এখান থেকে সরাতে পারবে না। কারণ আমরা বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, আর এই গাছ কৃষি দপ্তরের এক্তিয়ারে। আমি এই ফাইল আর্জেন্ট মার্ক করে এখনই কৃষি দপ্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকে উত্তর আসার পর আমরা গাছ সরাব।

দ্বিতীয় দিন কৃষি বিভাগ থেকে উত্তর এল, এই গাছ বাণিজ্য দপ্তরের লনে পড়েছে, সুতরাং এই গাছ সরানোর দায়িত্ব বাণিজ্য দপ্তরের।

উত্তর পড়ে বাণিজ্য দপ্তর যারপরনাই চটে গেল। তারাও সঙ্গে-সঙ্গে দিল কড়া জবাব, এই গাছ সরানো বা না-সরানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষি দপ্তরের। বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

পরের দিনও ফাইল চলতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যার সময় জবাব এল, আমরা এই সমস্যা হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টে পাঠালাম। কারণ এ এক ফলদার গাছের ব্যাপার। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট শাকসব্জি এবং খেত-খামার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। জামগাছ ফল দেয়। সুতরাং এই ধরনের ফলদার গাছের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টেরই অন্তর্গত।

রাত্রে মালি চাপা-পড়া মানুষটিকে ডাল-ভাত খাওয়াল। তার চারদিকে পুলিশের কড়া পাহারা বসেছে, কোনো মানুষ যেন নিজের হাতে কানুন তুলে নিয়ে গাছ সরানোর চেষ্টা না-করে। কিন্তু চাপা-পড়া মানুষটির প্রতি করুণা হয় একজন পুলিশের। সে মালিকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়।

মালি চাপাপড়া মানুষটিকে বলল 'তোমার ফাইল চলছে, মনে হচ্ছে কালকের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।'

চাপাপাড়া মানুষটি মালির কথার কোনো জবাব দেয় না।

মালি গাছটির দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, 'ভাগ্যিস গাছটা তোমার কোমরের একদিকে পড়েছে, কোমরের মাঝখানে পড়লে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙে যেত।'

চাপাপড়া মানুষটি কিন্তু মালির কথার কোনো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে না।

মালি আবার বলল, 'তোমার যদি কোনো ওয়ারিশ থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা বল, আমি তাকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।'

চাপাপড়া মানুষটি অনেক কষ্টে মালিকে বলল, 'আমি নিজেই বেওয়ারিশ।'

মালি দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল।

তৃতীয় দিন হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট খুব কড়া এবং ব্যঙ্গপূর্ণ জবাব দিল।

হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সাহিত্যদরদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ভাষায় লিখলেন, খুব আশ্চর্যের কথা যখন সমগ্র দেশে আমরা বৃক্ষ রোপণ করছি, তখনই আমাদের দেশে এমনকি সরকারি আইন আছে যার বলে বৃক্ষ কাটা যায়! বিশেষ করে এমন এক বৃক্ষ—যা ফল দেয়। আর এই বৃক্ষ হচ্ছে একটি জাম বৃক্ষ, যার ফল সবাই আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করে। আমাদের বিভাগ কোনোমতেই এই ধরনের এক ফলদার বৃক্ষকে কাটার অনুমতি দিতে পারে না।

একজন রসিক মানুষ আপসোস করে বলল, 'এখন তবে কী করা যায়? যদি গাছ কাটা না যায় তবে মানুষটিকেই কেটে বের করা হোক।' সে সবাইকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে দিল, 'দেখুন, যদি মানুষটিকে এখান থেকে কাটা যায় তবে অর্ধেক মানুষ এদিকে বেরিয়ে আসবে, অর্ধেক ঐদিকে। আর গাছটিও যেমনকার তেমন থাকবে।'

চাপা-পড়া মানুষটি তার কথার প্রতিবাদ করে উঠল, 'কিন্তু আমি যে মারা যাব।' একজন ক্লার্ক বলল, 'হাঁ, একথাও ঠিক।'

মানুষটিকে কাটার জন্য যিনি নিপুণ যুক্তি হাজির করছিলেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'আপনি জানেন না, আজকাল প্লাস্টিক সার্জারি কত উন্নতি সাধন করেছে। একে যদি দুখণ্ড করে কেটে বের করা যায় তবে প্লাস্টিক সার্জারি করে আবার জোড়া লাগানো যাবে।'

এইবার ফাইল মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হল। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এ্যাকশন নিল সঙ্গে-সঙ্গে। যেদিন তাদের ডিপার্টমেন্টে ফাইল পৌছল তার পরদিনই তারা ঐ ডিপার্টমেন্টের যোগ্যতম প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিল। সার্জেন খুঁটিয়ে চাপাপড়া মানুষটির স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্ট এবং মাংস পরীক্ষা করে এক রিপোর্ট লিখলেন : হাঁ, প্লাস্টিক অপারেশন হতে পারে এবং অপারেশন সফলও হবে, তবে মানুষটি মারা যাবে।

সুতরাং এই ফয়সালাও আর গ্রহণ করা হল না। রাত্রে মালি চাপাপড়া মানুষটিকে খিচুড়ি খাওয়াতে-খাওয়াতে বলল, তোমার ব্যাপারটি ওপর মহলে গেছে। শুনেছি কালকে সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত সেক্রেটারিদের মিটিং হবে। ঐ মিটিং-এ রাখা হবে তোমার কেস। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাপাপড়া মানুষটি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল,
'জানি আমাকে হয়তো অস্বীকার করবে না।
কিন্তু তোমার কাছে যখন খবর আসবে
তখন আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব।'

মালি আচমকা তার ঠোঁটে আঙুল রেখে আশ্চর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি...তুমি কবি?'

চাপাপড়া মানুষটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

পরের দিন মালি চাপরাসিকে বলল, চাপরাসি বলল ক্লার্ককে, ক্লার্ক হেডক্লার্ককে, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা সেক্রেটারিয়েটে খবর রটে গেল চাপাপড়া মানুষটি একজন কবি। আর দেখতে দেখতে কবিকে দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়ল। এই খবর শহরেও পৌঁছে গেল। আর সন্ধ্যার মধ্যে শহরের অলিগলিতে যত কবি আছেন তাঁরা এসে জমা হলেন। সেক্রেটারিয়েটের লন কবি, কবি আর কবিতে ভরে উঠল। চাপাপড়া মানুষটির চারদিকে কবি সম্মেলনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। সেক্রেটারিয়েটের কয়েকজন ক্লার্ক এবং আন্ডার সেক্রেটারি—যাঁরা সাহিত্য এবং কবিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাও থেমে গেলেন এখানে। কয়েকজন কবি চাপাপড়া মানুষটিকে তাঁদের কবিতা এবং দোঁহা শোনাতে শুরু করলেন। আর কয়েকজন ক্লার্ক তাকে তাঁর নিজস্ব কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বললেন।

চাপাপড়া মানুষটি যে একজন কবি, এই খবর যখন সেক্রেটারিয়েটের সাব কমিটিতে পৌঁছুল, তখন তাঁরা রায় দিলেন : চাপাপড়া মানুষটি একজন কবি, সুতরাং তার ব্যাপার ফয়সালা করতে হার্টিকালচার বা এগ্রিকালচার দপ্তর পারে না। এ সম্পূর্ণভাবে কালচারাল বিভাগের ব্যাপার। কালচারাল বিভাগকে অনুরোধ করা হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভাগ্য কবিকে চাপাপড়া ফলদার গাছ থেকে মুক্ত করা হোক।

ফাইল কালচারাল ডিপার্টমেন্টের এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগ ঘুরতে-ঘুরতে সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারির হাতে এল। বেচারা সেক্রেটারি ঠিক ঐ সময়েই গাড়িতে করে সেক্রেটারিয়েট এসে চাপাপড়া মানুষটির ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলেন।

—তুমি কবি?

সে জবাব দিল, 'আজ্ঞে হাঁ।'

—কোন নামে তুমি পরিচিত?

—ওস।

ওস? সেক্রেটারি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। "তুমি সেই ওস—যার পদ্য সংগ্রহ 'ওসের ফুল' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে?"

চাপাপড়া মানুষটি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হাঁ।'

সেক্রেটারি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাদের একাডেমির মেম্বার?

—না।

সেক্রেটারি বললেন, আশ্চর্যের কথা। এত বড় কবি—'ওসের ফুলে'র লেখক আমাদের একাডেমির সদস্য নয়! আহা কী ভুল হয়ে গেছে আমার, কত বড় কবি, অথচ কী অন্ধকারের নিচে নাম চাপা পড়ে আছে!

—আজ্ঞে, নাম চাপা পড়ে নেই, আমি স্বয়ং এক গাছের নিচে চাপা পড়ে আছি। দয়া করে আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করুন।

'এক্ষুণি করছি' বলে সেক্রেটারি তখনই নিজের দপ্তরে রিপোর্ট করলেন।

পরের দিন সেক্রেটারি ছুটতে-ছুটতে কবির কাছে এলেন। বললেন, 'নমস্কার, মিষ্টি খাওয়াও। আমাদের সাহিত্য একাডেমি তোমাকে কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য করে নিয়েছে। এই নাও তোমার সদস্যপত্র।'

চাপাপড়া মানুষটি বেশ কঠোরতার সঙ্গে তাঁকে বলল, 'আমাকে তো আগে এই গাছের নিচ থেকে বের করুন।' খুব ধীরে ধীরে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন খুব কঠিন অসুখ আর দুঃখের মধ্যে পড়েছে।

সেক্রেটারি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। আমি যা করতে পারি তা করে দিয়েছি। তুমি যদি মারা যাও তবে তোমার স্ত্রীকে পেনসন দিতে পারি।'

কবি থেমে-থেমে বলল, 'আমি বেঁচে আছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

সরকারের সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, 'মুশকিল কী জান, আমার দপ্তর শুধুমাত্র কালচারের সঙ্গে যুক্ত। গাছ কাটাকাটির ব্যাপার তো আর দোয়াতকলমে হয় না—কুড়াল-কাটারির সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আর্জেন্ট লিখে দিয়েছি।'

সন্ধ্যার সময় মালি এসে চাপা-পড়া মানুষটিকে বলল, 'কাল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসে গাছে কেটে দেবে, আর তুমিও বেঁচে যাবে।

মালি খুব খুশি। চাপাপড়া মানুষটির শরীরে আর কুলাচ্ছিল না। বাঁচার জন্যে সে যুঝে চলেছিল আপ্রাণ। কাল পর্যন্ত...কাল ভোর পর্যন্ত...যে কোনোভাবেই হোক কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে।

পরের দিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মানুষজন যখন কুড়াল-কাটারি নিয়ে গাছ কাটতে হাজির হল, তখন বৈদেশিক দপ্তর থেকে খবর এল, গাছ কাটা বন্ধ রাখ। কারণ দশ বছর আগে পিটোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের লনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন যদি এই গাছ কাটা হয় তবে পিটোনিয়া সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

একজন ক্লার্ক চিৎকার করে বলল, 'কিন্তু একজন মানুষের জীবনের প্রশ্ন যে জড়িত।'

আর একজন ক্লার্ক অন্য ক্লার্কটিকে বলল, 'আরে এ যে দু-দেশের সম্পর্কের প্রশ্ন। তুমি কি জান না পিটোনিয়া সরকার আমাদের দেশকে কীভাবে সহযোগিতা করছে। আমরা কি বন্ধুত্বের জন্য একজন মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে পারি না!'

—কবির মরে যাওয়া উচিত।

—নিশ্চয়ই।

আন্ডার সেক্রেটারি সুপারিনটেনডেন্টকে বললেন, 'আজ প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ করে ফিরছেন। বিকেল চারটায় বৈদেশিক দপ্তর এই গাছ সম্পর্কিত ফাইল তাঁর কাছে পেশ করবেন। উনি যা বলবেন তাই-ই হবে।'

বিকেল পাঁচটায় সেক্রেটারি স্বয়ং ফাইল নিয়ে হাজির হলেন। 'এই যে শুনছ।' খুশিতে গদ-গদ তিনি ফাইল দোলাতে-দোলাতে বললেন, 'এই গাছ কাটার হুকুম দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্ত আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কালই এই গাছ কাটা হবে। আর তুমিও বেঁচে যাবে এই সমস্যা থেকে। আরে শুনছ কি! আজ তোমার ফাইল পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু কবির হাত তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখের তারা স্থির। একসার পিঁপড়ে তার মুখের ভিতর ঢুকছিল।

তার জীবনের ফাইলও পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তোমার দুঃখ আমাকে দাও

রাজেন্দ্র সিংহ বেদী

মদন যেমন ভেবেছিল বিয়ের রাত ঠিক তেমনটি হয়নি।

চকলি বউদি মদনকে ফুসলিয়ে ঠেলে দিয়েছিল মাঝখানের ঘরে। ইন্দু সামনের শালুতে নিজেকে জড়িয়ে আঁধারেরই অংশ হয়ে বসেছিল। বাইরে চকলি বউদি, দরিয়াবাদী পিসি আর সব মহিলাদের হাসি রাতের শান্ত জলে মিছরির মতো ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছিল। মহিলারা বুঝেছিলেন যে, এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও মদন কিচ্ছু জানে না, কারণ যখন তাকে মাঝরাতের ঘুম থেকে জাগানো হল তখন সে হড়বড় করে বলেছিল—'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

এই মহিলাদের দিন চলে গেছে। বিয়ের পহেলা রাতে তারা তাদের স্বামীদের যে-সব কথা বলেছিল আর শুনেছিল তার প্রতিধ্বনি আজ তাদের স্মৃতিতে নেই। তারা কেবল সংসার করেছে আর এখন নিজের অন্য এক বোনকে সংসারের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ধরিত্রীর এই মেয়েরা এ-কথাই বুঝেছিল যে, পুরুষরা হল মেঘখণ্ড—তাদের প্রতিটি বর্ষণের জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে হয়। যদি না-বর্ষে তো প্রার্থনা করতে হয়, পূজা দিতে হয়, জাদুমন্ত্র পড়তে হয়। যদিও কালকাজির এই নয়া বসতিতে মদন ঘরের সামনে খোলা উঠানে শুয়েছিল, তবু তারই জন্য অপেক্ষায় ছিল ওরা। এক অশুভ লক্ষণের মতো পড়শি সিবৃতের মোষটা মদনের খাটের কাছে বাঁধা ছিল। মোষটা বারবার ফুঁ-ফুঁ করে মদনকে শুঁকছিল আর মদন চেষ্টা করছিল হাত তুলে তাকে দূরে রাখার—এই অবস্থায় ঘুমোনোর সুযোগ কোথায়?

সাগরের তরঙ্গে দোলা আর মেয়েদের রক্তে ঢেউ-তোলায় পারঙ্গম চাঁদ এক জানালা পথে অন্দরে চলে এসে দেখছিল, দরজার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে মদন পরবর্তী পদক্ষেপ কোন দিকে ফেলে। মদনের নিজের ভিতরে মেঘ গর্জন করছিল। বিজলি-বাতির থামে কান পাতলে যেমন তার ভিতরে শন্‌শন্‌ শব্দ শোনা যায় তেমনি শব্দ তার নিজেই ভিতরে শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর মদন এগিয়ে গিয়ে পালঙ্ক টেনে চাঁদের আলোয় নিয়ে এল যাতে করে নববধূর মুখ দেখা যায়। কিন্তু সে থমকে দাঁড়াল। সে তখনি ভাবল—ইন্দু আমার বউ, পরস্ত্রী তো নয়, পরস্ত্রীকে স্পর্শ না-করার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই সে পেয়ে এসেছে। শালুর মধ্যে সেঁধিয়ে-থাকা নববধূকে দেখতে-দেখতে মদন সিদ্ধান্তে এল যে, এইখানে ইন্দুর মুখ লুকিয়ে আছে। ভাবনামতো পাশে পড়ে থাকা গাঁটরিটা হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল, সেখানেই ইন্দুর মুখ। মদন ভেবে ছিল যে, ইন্দু সহজে নিজে থেকে তার মুখ দেখতে দেবে না। কিন্তু ইন্দু এরকম কিছু করেনি। কেননা,

কয়েকবছর আগে থেকে সে-ও এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল, অন্যদিকে কোনো কাল্পনিক মোষের শুঁকতে থাকার ফলে তারও ঘুম আসছিল না। চলে-যাওয়া ঘুম আর বন্ধ-করা চোখের বেদনা সমেত আঁধার ছাড়াও সামনে ধড়ফড়-করা কিছু একটা নজরে এল মদনের। চিবুক পর্যন্ত পৌছতে-পৌছতে মুখ সাধারণত লম্বা হয়ে যায় কিন্তু এখানে সব কিছুই গোল দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় গাল আর ঠোঁটের মাঝে এক ছায়াদার টোল তৈরি হয়েছিল—যেমন সবুজ ক্ষেত আর সুন্দর টিলার মাঝখানে হয়ে থাকে। কপালটি তার ছোট, কিন্তু তার ওপর হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কুঞ্চিত কেশরাশি—

তখন ইন্দু তার মুখ সরিয়ে নিল। যেন সে মুখ দেখার অনুমতি দিয়েছিল তবে এতক্ষণ ধরে নয়। আর লজ্জার তো কোনো সীমা নেই। মদন কিছুটা শক্ত হাতেই হুঁ-হুঁ করতে থাকা নববধূর মুখ ফের ওপরে তুলে মাতালের মতো গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলল—'ইন্দু!'

ইন্দু কিছুটা ভয় পেয়েছিল। জীবনে এই প্রথমবার কোনো অপরিচিত পুরুষ এইভাবে তার নাম ধরে ডাকল আর সেই অপরিচিত পুরুষের দৈবী অধিকারের দাবিতে রাতের আঁধারে ধীরে-ধীরে একাকী বন্ধুহীন অসহায় নারীর আপন মানুষ হয়ে যাচ্ছিল সে। ইন্দু এই প্রথমবার একনজর ওপর দিকে তাকিয়ে, তারপর চোখ বন্ধ করে কেবল এটুকু বলেছিল—'জি।'...তার আপন কণ্ঠস্বর পাতাল থেকে উঠে আসা শব্দের মতো শুনিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল। তারপর ধীরে-ধীরে কথাবার্তা হতে লাগল। এখন যে কথা চালানো সম্ভব তাই চলছিল। ইন্দু থামছিলই না। ইন্দুর বাবা, ইন্দুর মা, ইন্দুর ভাই, মদনের ভাই-বোন-বাপ, তার রেলের চাকরি, তার মেজাজ, জামা-কাপড়ের পছন্দ, খাওয়ার অভ্যাস—সব কিছুরই হিসাব নিচ্ছিল সে। মাঝে-মাঝে মদন ইন্দুর কথা থামিয়ে দিয়ে অন্য কিছু বলতে চাইলে ইন্দু এড়িয়ে যাচ্ছিল—সীমাহীন অসহায় অবস্থায় মদন তার মায়ের কথা তুলল। মা তার সাত বছর বয়সে তাকে ছেড়ে খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। 'যতদিন পর্যন্ত বেচারি মা বেঁচেছিলেন', মদন বলল—'ততদিন বাবুজির হাতে ওষুধের শিশিই দেখতাম, আমি হাসপাতালের সিঁড়ির উপর আর পাশের ছোট ঘরে পিঁপড়ার সারির উপর শুয়ে থাকতাম, আর শেষে একদিন—২৮ মার্চের সন্ধেবেলায়...' বলতে বলতে মদন চুপ করে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্রন্দন তার গলা ভরে যাওয়ায় এ-ধারে-ওধারে পৌছে গেল। ইন্দু ঘাবড়ে গিয়ে মদনের মাথা টেনে নিল নিজের বুকে। তার ক্রন্দনের মুহূর্ত-অবসরে ইন্দু নিজের এ-ধারে আর ও-ধারে ছড়িয়ে গেল (দূরের মানুষ কাছে হল)। মদন ইন্দুর সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলে ইন্দু তার হাত চেপে ধরে বলল—'আমি তো লেখাপড়া জানি না। জীবনে আমি দেখেছি মা আর বাবা, ভাই আর ভাই-বউ, আরো অনেক লোক দেখেছি, এ-কারণে আমি কিছু-কিছু বুঝি। আমি এখন তোমার। নিজের বদলে তোমার কাছে একটা জিনিস চাইছি...'

কাঁদতে-কাঁদতে কান্নার নেশা ধরে যায়। মদন কিছুটা অধীরতা আর কিছুটা উদারতা মিলিয়ে বলল—

'কী চাইছ? তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।'

'পাকা কথা?' ইন্দু বলল।

মদন কিছুটা ব্যাকুল হয়ে বলল—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছি তা পাকা কথা।'

কিন্তু এর মধ্যেই মদনের মনে এক ভাব এল। আমার কারবার আগের থেকেই মন্দা চলছে; যদি ইন্দু এমন কিছু জিনিস চায় যা আমার সামর্থ্যের বাইরে তা হলে কী হবে? কিন্তু ইন্দু মদনের শক্ত আর প্রসারিত হাত আপন নরম হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার গালে আপন গাল রেখে বলল—

'তোমার দুঃখ আমাকে দিয়ে দাও।'

মদন খুব হতাশ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে তার ঘাড় থেকে এক বোঝা নেমে গেল বলে অনুভব করল। সে ফের চাঁদের আলোয় ইন্দুর মুখ দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। মদন ভাবল মা অথবা কোনো সখির কাছে শেখা মুখস্থ প্রবাদ ইন্দু তাকে বলেছে। আর তখনি এক তপ্ত অশ্রুবিন্দু মদনের হাতের কব্জির উপর পড়ল। সে ইন্দুকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে নিতে বলল—'দিলাম।' এই-সব কথাবার্তা মদনকে অনেকটা স্বাভাবিক সহজ করে তুলল।

এক-এক করে সব অতিথি বিদায় নিল। চকলি বউদি দুই বাচ্চাকে দু হাত ধরে সিঁড়ির উঁচু-নিচু ধাপে নিজেকে সামলে চলে গেল। দরিয়াবাদী পিসি তার ন লাখ টাকার হার হারিয়ে গেছে বলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল। হাঙ্গামা করতে-করতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল; সেই হার পাওয়া গেল স্নানের ঘরে। যৌতুক থেকে তার প্রাপ্য তিনখানা শাড়ি নিয়ে পিসি চলে গেল। তারপর গেলেন খুড়োমশায়—জে. পি. হবার খবর মদনের মারফত পেয়ে এমনই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন যে মদনের বদলে তিনি নববধূর মুখচুম্বন করতে যাচ্ছিলেন।

বাড়িতে থাকল কেবল বুড়ো বাপ আর ছোট ভাইবোন। ছোট্ট দুলারি তো সব-সময় বউদির গায়ে লেপটে থাকে। গলি-মহল্লার কোনো বউ নববধূকে তাকিয়ে দেখে অথবা না-দেখে, যদি দেখে তো কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, এই সব তার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল। শেষ পর্যন্ত এই সবও মিটে গেলে ইন্দু ধীরে-ধীরে পুরনো হতে লাগল। কিন্তু কালকাজির এই নয়া বসতিতে আজ পর্যন্ত লোক আসতে-যেতে মদনের বাড়ির সামনে থমকে যায় আর কোনো অছিলায় অন্দরে চলে আসে। ইন্দু তাদের দেখামাত্রই ঘোমটা টেনে দিত। কিন্তু ওই সামান্য অন্তরাল থেকেই যেটুকু দেখা যেত তা বিনা-ঘোমটায় দেখা যেতে পারত না।

মদনের কারবার ছিল দুর্গন্ধ বিরোজার। কোনো বড় সরবরাহকারীর দু-তিনটি জঙ্গলে চীড় আর দেবদারু গাছের জঙ্গলে আগুন ধরে যায় আর দাউ-দাউ করে জ্বলতে-জ্বলতে কালি হয়ে যায়। মহীশূর আর আসাম থেকে আনানো বিরোজার দাম বেশি পড়ে যেত। কিন্তু লোকে বেশি দামে তা কিনতে রাজি নয়। একে তো আমদানি কমে গিয়েছিল তার ওপর মদন তাড়াতাড়ি দোকান আর সংলগ্ন দফতর বন্ধ করে ঘরে চলে আসত—ঘরে পৌঁছে তার একমাত্র প্রয়াস ছিল যে, সকলে খাওয়া-দাওয়া করে যেন তাড়াতাড়ি আপন-আপন বিছানায় শুয়ে পড়ে। খাবার সময় সে নিজেই থালা তুলে বাপ আর বোনের সামনে রাখত আর তাদের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো বাসন সব গুছিয়ে নিয়ে কলের নিচে রেখে দিত। সবাই ভাবত, বধূ মদনের কানে যে কোনো মন্ত্র পড়ে দেওয়াতেই সে ঘরের কাজেকর্মে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে। মদন ছিল সকলের চেয়ে বড়। কুন্দন তার ছোট, পাশী সবচেয়ে ছোট। যখন কুন্দন বউদির সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবার জেদ ধরত তখন বাপ ধনীরাম তাকে বকে দিতেন—'তুমি খাও'—বলতেন, 'বউ পরে খেয়ে নেবে।' ধনীরাম রান্নাঘরের এদিক-ওদিক

দেখতেন, আর যখন বউ খাওয়া-দাওয়া থেকে ছুটি পেত আর বাসনকোসনের প্রতি মনোযোগ দিত তখন বাবু ধনীরাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন—'রেখে দাও বউমা, বাসনকোসন সকালে ধোয়া যাবে।' ইন্দু বলত, 'না বাবুজি, আমি এখনি ধুয়ে দিচ্ছি।' বাবু ধনীরাম কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলতেন—'মদনের মা যদি আজ থাকত বউমা, তা হলে সে কি তোমায় এসব করতে দিত?' তখন ইন্দু একেবারে হাত গুটিয়ে নিত।

ছোট্ট পাশী বউদিকে দেখে লজ্জা পেত এ-কথা ভেবে যে, নববধূ খুব তাড়াতাড়ি গর্ভবতী হয়েছিল। চকলি বউদি আর দরিয়াবাদী পিসি রেওয়াজমতো পাশীকে ইন্দুর কোলে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে ইন্দু তাকে কেবল দেওর নয়, নিজের ছেলের মতো দেখত। যখনি সে আদর করে পাশীকে দুহাতের মধ্যে নেয়ার চেষ্টা করত তখনি পাশী ঘাবড়ে দিয়ে হাত ছাড়িয়ে দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত আর হাসত, কাছে আসত না, দূরেও পালাত না। এক আশ্চর্য যোগাযোগে ঠিক এই সময়েই বাবুজি প্রতিবার সেখানে হাজির হাতেন আর পাশীকে ধমক দিয়ে বলতেন,—'আরে যা না...বউদি আদর করে ডাকছে...তুই কি এখনি জোয়ান-মদ্দ হয়ে গেলি?' ... আর দুলারি তো পিছু ছাড়েই না। 'আমি বউদির কাছেই শোব'—তার এই জিদ বাবুজির মনের মধ্যে কোনো 'জনার্দন'কে জাগিয়ে দিত। এক রাতে এই ব্যাপারে দুলারির ওপর জোরে চড় পড়ল আর সে ঘরের আধা-কাঁচা আধা-পাকা নালিতে গিয়ে পড়ল। ইন্দু দৌড়ে গিয়ে ধরল তাকে—তার মাথা থেকে উড়ে গেল দোপাট্টা, চুলের ফুল আর পাখি গেল পড়ে। মাথার সিঁদুর, কানের ফুল সব উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। 'বাবুজি!' ইন্দু শ্বাস রুদ্ধ করে ডাকল। একই সঙ্গে দুলারিকে ধরতে গিয়ে আর মাথার উপরে দোপাট্টা ঢাকতে গিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল। মায়ের মতোই বাচ্চাকে বুকে নিয়ে ইন্দু মাথার দিকে—যেখানে অনেক বালিশ ছিল—সেখানে বিছানা করে তাকে শুইয়ে দিল। খাটের না ছিল প্রান্ত, না ছিল কাঠের বাজু। চোট তো একতরফা গেঁথে-যাওয়া জিনিস নয়। দুলারির শরীরে আহত অংশের উপর ইন্দু এমনভাবে আঙুল বুলিয়েছিল যে তাতে বেদনাও হচ্ছিল আবার তা আরামও দিচ্ছিল। দুলারির গালের ওপর বড় বড় টোল পড়ত। ওই সব টোলের তারিফ করে বলত ইন্দু—

'তোর শাশুড়ি মরুক ... গালের ওপর কেমন সুন্দর টোল পড়ে।' মুন্নি একেবারে খুকির মতো বলত—বউদি, তোমার গালেও তো টোল পড়ে ...' 'হ্যাঁ মুন্নি', বলে ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

কোনো কথায় মদনের রাগ হয়েছিল। সে পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবকিছু। বলল—'আমি তো বলছি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে...'

'কেন? ভালো কেন হয়েছে?' ইন্দু প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, বাঁশ যদি না-থাকে তো বাঁশি বাজে না ... শাশুড়ি না-থাকে তো ঝগড়াও থাকে না।'

ইন্দু সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—'তুমি যাও তো, শুয়ে পড়ো গে, বড় এসেছেন ... মানুষ বেঁচে থাকে বলেই তো লড়াই করে। শ্মশানের চুপ-চাপ থেকে ঝগড়া ভালো। যাও না, রান্নাঘরে তোমার কী কাজ?'

মদন রাগ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবু ধনীরামের ধমকে আর সব বাচ্চারা আগেই আপন-আপন বিছানায় শুয়ে পড়েছিল—যেন ডাকঘরে চিঠি সর্ট হয়ে যে যার জায়গায় চলে গেছে। কিন্তু মদন দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। তার প্রয়োজন তাকে উদ্ধত আর

লজ্জাহীন করে দিয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে যখন ইন্দুও তাকে ধমকে দিল তখন সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে অন্দরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মদন বিছানায় পড়ে ছটফটাল। কিন্তু বাবুজির ভয়ে ইন্দুকে চেঁচিয়ে ডাকবার সাহস হল না তার। মদনের ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেল যখন মুন্নিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ইন্দু ঘুমপাড়ানি ছড়া গাইছিল।—'আয় ঘুম রানি, বৌরানি, মস্তানি'।

দুলারি মুন্নিকে যে ঘুমপাড়ানি ছড়া গেয়ে ইন্দু ঘুম পাড়াচ্ছিল, সেই ছড়া এদিকে ঘুম তাড়াচ্ছিল মদনের। নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে মদন সজোরে চাদর ধরে টানল। শাদা চাদর মাথায় ঢাকা দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে খামোখা মড়ার মতো পড়ে রইল সে। মদনের মনে হল যে, সে মরে গেছে আর তার নববধূ ইন্দু তার পাশে বসে জোরে-জোরে মাথা কুটছে। দেয়ালে কবজির আঘাত করে চুড়ি ভাঙছে আর পড়তে-পড়তে কাঁদতে-কাঁদতে রান্নাঘরে গিয়ে চুলোর ছাই মাথায় দিচ্ছে, আবার বাইরে দৌড়ে এসে হাত তুলে মহল্লার লোকের কাছে নালিশ জানাচ্ছে—'সকলে দেখ, আমি মারা গেছি।' এখন তার দোপাট্টার পরোয়া নেই, জামাকাপড়ের পরোয়া নেই, মাথার সিঁদুর, কেশের ফুল আর পাখি সব উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

মদনের দুচোখ দিয়ে সবেগে অশ্রু বয়ে আসে, যদিও রান্নাঘরে বসে ইন্দু হাসছিল। মুহূর্তের মধ্যেই তার সৌভাগ্য বিনষ্ট হল আবার তার অজ্ঞাতেই সৌভাগ্য ফিরে এল। মদন যখন বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এল তখন চোখের জল মুছতে-মুছতে নিজের পরেই হাসতে লাগল। ও-ধারে ইন্দু হাসছিলই। কিন্তু তা চাপা হাসি। বাবুজির উপস্থিতির কারণে সে কখনো উঁচু গলায় হাসত না, খিলখিল করে হাসিও একরকমের বেহায়াপনা, দোপাট্টা আর চেপে-চেপে হাসি ঘোমটার কাজ করত। মদন মনে-মনে ইন্দুর এক খেয়ালি মূর্তি বানিয়ে তার সঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল। সে তাকে এমন আদর করেছিল যেমন আদর আজ পর্যন্ত করেনি। মদন আবার তার বাস্তব পরিবেশে ফিরে এসে দেখল—পাশের বিছানা খালি পড়ে আছে। সে হালকা আওয়াজে ডেকেছিল 'ইন্দু', তারপর চুপ করে গিয়েছিল। ওই ইতস্ততভাবের মধ্যে সে ঘুমের আবেশে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার মনে যে বিয়ের রাতে পড়শি সিবতের মোষ তার মুখের কাছে ফোঁস-ফোঁস করছিল। মদন বিকল অবস্থায় উঠে বসল, তারপর রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে দু-তিন বার আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে পড়েছিল ফের। ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

মদন কান খাড়া করে কোনো কিছু শোনার প্রত্যাশায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিছানার ভাঁজ দুরস্ত করতে গিয়ে ইন্দুর চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠলে মদন হড়বড় করে উঠে বসল। হঠাৎ জেগে যাওয়ায় তার মধ্যে প্রণয়ভাবনা হঠাৎ বেড়ে গেল। আরাম করে পাশ না ফিরে লোকে ঘুমিয়ে গিয়ে হঠাৎ জোগে উঠলে প্রেমের দম ফুরিয়ে যায়। মদনের সারা শরীর ভিতরকার আগুনে জ্বলছিল আর সেজন্যই তার রাগ হয়েছিল। এবার সে ইন্দুকে বিরক্তির সঙ্গে বলল—

'তা হলে তুমি এসে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'খুকি শুয়েছে, না মরেই গেল?'

ইন্দু ঝুঁকে-পড়া অবস্থা থেকে একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'হায় রাম!' নাকের উপর আঙুল রেখে সে বলল—

'কী কথা বলছ? বেচারি মরবে কেন—মা-বাপের একমাত্র মেয়ে—'

'হ্যাঁ', মদন বলল—'বউদির একমাত্র ননদ।' তারপরই হুকুম দেয়ার স্বর আয়ত্ত করে বলল—'ওটাকে বেশি মাথায় তুল না।'

'তাতে কোনো পাপ হবে?'

'পাপ হবে,' মদন রেগে গিয়ে বলল—'তোমার পিছু ছাড়ে না। যখনি দেখি জোঁকের মতো লেগে আছে। আমি তো কোনো সুযোগই পাই না ...'

'হায়।' ইন্দু মদনের চারপাইয়ের উপর বসতে-বসতে বলল—'বোনদের আর মেয়েদের এভাবে দূর্-দূর্ করা ঠিক নয়। বেচারি দু দিনের অতিথি। আজ নয়ত কাল, কাল নয় পরশু একদিন তো চলে যাবে ...' এ-বিষয়ে ইন্দু কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু সে চুপ করে গেল। মনশ্চক্ষুতে ইন্দু নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন, খুড়ো, জেঠা, জেঠিমা সকলেই দেখা দিয়ে গেল একবার করে। কোনো একদিন সে তাদের আদরের পুতুল ছিল, চোখের পলকে সে তাদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেল, এখন দিনরাত তার বেরিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে, যেন ঘরে কোনো বুড়ি শাশুড়ি আছে। কোনো ঘরে যদি সাপ থাকে, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত-না ওই সাপকে তার গর্তে ধোঁয়া দিয়ে মেরে ফেলা যায় ততক্ষণ ঘরের লোক নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। দূর-দূরান্ত থেকে সাপকে খুঁটিগাড়ার, দড়ি দিয়ে বাঁধার, বিষদাঁত ভেঙে দেয়ার মাদারিদের ডেকে আনা হয়। বড় বড় ধন্বন্তরী আর মোতিসাগররা আসে—শেষে একদিন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে লাল আঁধি এসে যায়। তা সাফ হয়ে যাবার পর একটি লরি এসে দাঁড়ায়—তাতে সলমা-চুমকিওয়ালা শাড়িতে জড়িয়ে থাকা এক নববধূ বসে থাকে। পিছনের ঘরে এক সুর বাজতে থাকে, সানাই-এর আওয়াজ শোনা যায়। তারপর এক ধাক্কায় লরি চলতে থাকে।

মদন কিছুটা রাগের সঙ্গে বলল—

'তোমরা মেয়েছেলেরা খুব চালাক। গতকালই এ বাড়িতে এসেছ আর আজ এখানকার সব লোকের প্রতি আমার চেয়ে তোমার বেশি ভালোবাসা জন্মেছে?'

'হ্যাঁ।' ইন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

'এ সব মিথ্যা। এ হতে পারে না।'

'তোমার মতলব আমি...'

'এ-সব শুধু লোক দেখানো...হ্যাঁ।'

'আচ্ছা জি।' ইন্দুর চোখে জল এসে যায়, সে বলে—'এ সব কিছুই আমার দেখানো?' ইন্দু উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় চলে যায় আর শিয়রের দিকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে। মদন তার অভিমান ভাঙাতে চায়, কিন্তু ইন্দু নিজেই উঠে মদনের কাছে আসে আর শক্ত করে তার হাত ধরে বলে—

'তুমি সব সময় বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে কথা বলছ, তোমার হয়েছে কী?'

স্বামীর মতো রোয়াব দেখাবার সুযোগ মদন পেয়ে যায়—'যাও ...যাও...শুয়ে পড়ো গে', মদন বলে—'তোমার কাছে আমার কিছুই নেওয়ার নেই...'

'তোমার কিছু নেওয়ার নেই তো আমার নেওয়ার আছে,' ইন্দু বলল—'সারা জীবন নেওয়ার আছে।' সে মদনের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করতে থাকে। মদন তাকে ধুৎ-ধুৎ

করে আর সে মদনের গায়ে পড়ে মিশে যেতে চায়। সে ছিল সেই মাছের মতো যে স্রোতের সঙ্গে বহে যাবার বদলে ঝরনা খরস্রোতের বিপরীতে সাঁতরে উপরে পৌছতে চায়। সে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করল, হাত ধরল, কেঁদে-হেসে বলল—

'ফের আমাকে একেবারে কুটনি বলবে?'

'সব মেয়েছেলেই তো তাই।'

'থাম...তোমার তো...' মনে হল যেন ইন্দু কোনো গালি দিচ্ছে আর মুখে কী একটা গুন্-গুন্ করেছে। মদন দূরে বসে বলল—'কী বললে?' আর ইন্দু শোনবার মতো আওয়াজ করে ফের বলল সে-কথা। মদন খিল্-খিল করে হাসতে লাগল। পরক্ষণেই ইন্দু মদনের পাশে শুয়ে পড়ে বলছিল—

'তোমরা পুরুষরা কী জান?—যার সঙ্গে ভালোবাসা হয় তার সব ছোটবড় আত্মীয়ের সঙ্গেই ভালোবাসা হয়। কি বাপ, কি ভাই, আর কি বোন—' হঠাৎ দূরের দিকে তাকিয়ে ইন্দু বলে—

'আমি দুলারি-খুকির বিয়ে দেব।'

'চূড়ান্ত হয়ে গেল', মদন বলল—'এখনো সে এক হাত লম্বা হয়নি, এখনি তার বিয়ের কথা ভাবছ...'

'তুমি তো এক হাত দেখছ', বলে ইন্দু নিজের দুহাত মদনের চোখের উপর রেখে বলতে থাকে—'একটু সময় চোখ বন্ধ করে আবার খোল'— মদন সত্যি-সত্যি চোখ বন্ধ করল, কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ খোলে না দেখে ইন্দু বলল—'এখন তো খোল, এতক্ষণের মধ্যে আমি বুড়ি হয়ে যাব'—শুনে চোখ খুলল মদন। মুহূর্তের জন্য মদনের মনে হয় সামনে ইন্দু নয়, আর কেউ বসে আছে। সে যেন হারিয়ে গেছে।

'আমি তো এখন থেকেই চার স্যুট আর কিছু বাসনপত্র ওর জন্যে আলাদা করে রেখেছি', ইন্দু বলল। মদন কোনো জবাব দিল না দেখে ঝাঁকি দিয়ে আবার বলল—'তুমি কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ? নিজের ছেলেবেলার কথা মনে নেই?—তুমি তোমার দুঃখ আমাকে দিয়ে দিয়েছ...?'

'অ্যাঁ!' মদন চমকে উঠে বসল আর নিশ্চিত হয়ে গেল, কিন্তু সে যখন ইন্দুকে নিজের সঙ্গে সাপটে মিশিয়ে নিল তখন সে আর একটি শরীর রইল না—সঙ্গে-সঙ্গে এক আত্মাও তার আত্মার সঙ্গে মিলে গেল।

মদনের কাছে ইন্দু হল আত্মার আত্মা। ইন্দুর ছিল সুন্দর শরীর কিন্তু হামেশা কোনো-না-কোনো কারণে সে মদনের আড়ালে থাকে। একটা পর্দার আড়ালে। স্বপ্নের সুতোয় বোনা, নিঃশ্বাসের ধোঁয়ায় রঙিন। উচ্চ হাসির সোনালি কিরণে উজ্জ্বল আলো ইন্দুকে ঢেকে রাখত। মদনের নজর আর তার হাতের দুঃশাসন বহু শতাব্দী ধরে ওই দ্রৌপদীর—যাকে সাধারণত বউ বলা হয়—বস্ত্রহরণ করতে থাকে। কিন্তু হামেশা আসমান থেকে থানের পর থান, গজের পর গজ কাপড় তার উলঙ্গতা ঢাকবার জন্য নেমে আসে। দুঃশাসন শ্রান্ত হয়ে কোনো একখানে ঢলে পড়ে কিন্তু দ্রৌপদী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ইজ্জত আর শুচিতার শাদা শাড়ি-পরিহিতা সে নারী দেবীর মতো দেখায় আর—

...মদনের ফিরে আসা হাত লজ্জার ঘামে ভিজে যায়। তা শুকোবার জন্য সে হাত উপরে ওঠায় আর হাতের পাঞ্জা সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে আপন চোখের মনির

সামনে মেলে ধরে। ফের আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখে ইন্দুর মর্মর শুভ্র গৌরবর্ণ আর কোমল শরীর সামনে পড়ে আছে। ভোগের জন্য সে-শরীর পাশেই আছে, বাসনার জন্যে দূরে...যদি কখনো ইন্দুর সঙ্গে কলহ হয়ে যায় তো এই রকমের মন্তব্য হয়—

'হায় জি, ঘরে ছোট-বড় সবাই আছে...তারা কী বলবে?'

মদন উত্তর দেয়—'ছোটরা বোঝে না ...বড়রা বুঝে যায়।'

এর মধ্যে বাবু ধনীরাম সাহারানপুরে বদলি হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি রেলের মেল সার্ভিসের সিলেকশন গ্রেডে হেড ক্লার্ক হয়ে গেলেন। এত বড় কোয়ার্টার পাওয়া গেল যে সেখানে আটটা পরিবার থাকতে পারে। কিন্তু বাবু ধনীরাম একাই সেখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে থাকতেন। সারা জীবনে তিনি কখনো বাচ্চাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকেননি। পুরো ঘরোয়া মেজাজের লোক ছিলেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এই একাকিত্ব তাঁর হৃদয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যাবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি নাচার। সব ছেলেমেয়ে দিল্লিতে মদন আর ইন্দুর কাছে থেকে সেখানেই স্কুলে পড়ে। বছর শেষ হবার আগেই মাঝখানে নিয়ে এলে তাদের লেখাপড়া ভালো হত না। বাবুজির হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত পড়তে লাগল।

অবশেষে গরমের ছুটি হল। তিনি বারবার লেখায় মদন ইন্দুকে কুন্দন, পাশী আর দুলারির সঙ্গে সাহারানপুর পাঠিয়ে দিল। ধনীরামের দুনিয়া মুখরিত হয়ে উঠল আবার। কোথায় তাঁর দফতরের কাজের পরে ছিল অবসরের পর অবসর, আর এখন কাজের পর কাজ। বাচ্চারা বাচ্চাদের মতোই যেখানে জামা-কাপড় খুলত সেখানেই ফেলে রাখত, আর বাবুজি তা গুছিয়ে রাখতেন। মদন থেকে দূরে থাকার ফলে আলস্যে-ভরা ইন্দু তো নিজের পোশাক সম্পর্কেও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। সে রান্নাঘরে এমনভাবে ঘুরত-ফিরত যেন খোঁয়াড়ের গরু বাইরের দিকে মুখ তুলে আপন মালিককে খুঁজছে। কাজকর্মের পর সে কখনো অন্দরে ট্রাংকের উপরেই শুয়ে পড়ত, কখনো-বা বাইরে 'কনের' ফুলগাছের কাছে আবার কখনো-বা আমগাছের নিচে আঙিনায় বসে পড়ত। শত-শত হাজার-হাজার হৃদয়ে সে-আশ্রয় শীতলতা এনে দিত।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আমের দিন চলে যায়। আঙিনা থেকে বাইরের দরজা খুললে দেখা যায় কুমারী আর নববিবাহিতা মেয়েরা দোলনায় দোল দিতে-দিতে গাইছে—'আমের শাখায় দোলনা কে বাঁধল'—আবার গানের তালের অনুসরণে দুলতে থাকে আর দোল দিতে থাকে—আর যদি চারজন একত্র হয় তো লুকোচুরি খেলে। প্রৌঢ়া আর বুড়ির দল একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। ইন্দুর মনে হয় সে-ও যেন ওদেরই একজন হয়ে গেছে। তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবুজি কাছ দিয়ে যান তো তাকে জাগাতে কিংবা তুলতে একটুও চেষ্টা করেন না, পরন্তু সুযোগ পেয়ে তার সালোয়ার, যার বদলে বউ শাড়ি পরে আর যা হামেশা শাশুড়ির পুরনো চন্দন কাঠের সিন্দুকে তুলে রাখে, তা তুলে নিয়ে খুঁটিতে টাঙিয়ে দেন। এই কাজে তাঁকে সব নজর বাঁচিয়ে চলতে হয়; কিন্তু যখন সালোয়ার গুছিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর নজর নিচের কোণে বধূর চোলির ওপর গিয়ে পড়ে, তখন তাঁর সাহস চলে যেত। আর তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতেন—যেন কোনো সাপের বাচ্চা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপর বারান্দা থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যেত—'ওম্ নম ভগবতে বাসুদেবায়'।

আশপাশের মহিলারা বাবুজির পুত্রবধূর সৌন্দর্যের বর্ণনা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোনো মহিলা বাবুজির সামনে বধূর সৌন্দর্যের আর সুডৌল শরীরের প্রশংসা করলে তিনি খুশিতে ফেটে পড়ে বলেন—'আমীচন্দের মা, আমি তো ধন্য হয়ে গেলাম। ঈশ্বরের দয়া, আমার ঘরে এক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এসেছে।' আর এ-কথায় তাঁর নজর অনেক দূর চলে যায় যেদিকে অসুখ, ওষুধের শিশি, হাসপাতালের সিঁড়ি আর পিঁপড়ের গর্ত। নজর কাছে এলে তিনি মোটাসোটা ভরা-শরীর বাচ্চাদের বগলে, কাঁধে, ঘাড়ে চড়বার নামবার অনুভূতিতে ভরে ওঠেন। আর তাঁর মনে হয় আরো বাচ্চা আসছে। পাশে শুয়ে-থাকা বউয়ের কোমর মাটির সঙ্গে মিশে যায় আর কনুই ছাদের সঙ্গে লেগে থাকে আর তাদের বাচ্চাদের বয়সের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। কেউ বড় নয় কেউ ছোট নয়, সবাই একসঙ্গে জড়-সড়...'নমামি, ওম্ নম ভগবতে...'

আশপাশের সব লোক জেনে গিয়েছিল যে, ইন্দু বাবুজির স্নেহের পুত্রবধূ। দুধ আর ঘোলের ভাঁড় ধনীরামের ঘরে আসতে থাকে। একদিন সলামদিন গুজর ফরমায়েশ করে দেয়। ইন্দুকে বলে—'বিবি, আমার ছেলেটাকে আর.এম.এস.-এ কুলির কাজে রাখিয়ে দাও, আল্লা তোমাকে সুফল দেবেন। ইন্দুর ইশারায় কিছুদিনের মধ্যে সলামদিনের ছেলে কুলি হয়ে গেল—সে সর্টার হতে পারল না, তার ভাগ্য।

পুত্রবধূর খাওয়া-দাওয়া আর স্বাস্থ্যের প্রতি বাবুজি নিজেই খেয়াল রাখতেন। ইন্দু দুধ অপছন্দ করত। তিনি রাতের বেলা নিজেই বাটিতে দুধ ফুটিয়ে গ্লাসে ঢেলে বধূকে খাওয়াবার জন্যে তার খাটিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। ইন্দু নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসত আর বলত—'না বাবুজি, আমার দুধ খেতে ভালো লাগে না...।'

'তোর শ্বশুরও তো খাবে।' তিনি মজা করে বলতেন।

'তা হলে আপনিই খেয়ে নিন না।' ইন্দু হেসে জবাব দিত আর বাবুজি ছদ্মরোষে ফেটে পড়তেন—'তুই চাস যে পরে তোরও ওই অবস্থা হোক যা তোর শাশুড়ির হয়েছিল?'

'হুঁ...হুঁ...' ইন্দু অভিমান করত। আর অভিমান কেনই-বা না করবে। তারাই অভিমান করে না যাদের অনুনয় করে ভোলাবার কেউ নেই। কিন্তু এখানে তো অনুনয়কারী সবাই, অভিমানকারী কেবল একজন। যখন ইন্দু বাবুজির হাত থেকে গ্লাস নিত না তখন উনি খাটিয়ার পাশে শিয়রের নিচে তা রেখে দিতেন—আর—'নে, এখানে রইল—তোর মর্জি হয় তো খা—না হয় তো খাস না'—বলে চলে যেতেন।

আপন বিছানায় পৌঁছে ধনীরাম দুলারির সঙ্গে খেলা করতেন। দুলারি বাবুজির খালি গায়ে গা লাগিয়ে ঘষত আর তাঁর পেটের ওপর মুখ লাগিয়ে ফু-ফু করত,—এটাই তার অভ্যাস ছিল। আজ যখন বাবুজি আর খুকি এই খেলা খেলতে-খেলতে হাসছিল, তখন খুকি বউদির দিতে তাকিয়ে বলল—'দুধ নষ্ট হয়ে যাবে বাবুজি, বউদি তো খাচ্ছে না।'

'খাবে, নিশ্চয় খাবে বেটি', বাবুজি অন্য হাতে পাশীকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে-নিতে বললেন—

'মেয়েরা ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট হওয়া দেখতে পারে না...' এই মন্তব্য বাবুজির মুখ থেকে শোনা যেত। আর অন্যদিক থেকে ভেসে আসত 'হুশ্...শ্...ভাতারখাগী' বধূ বিড়াল তাড়াচ্ছে—কিছুক্ষণ পরে ঢক্‌ঢক্ শব্দে সবাই জেনে নিত যে বধূ-বৌদি দুধ খেয়ে নিয়েছে। তারপর কুন্দ বাবুজির কাছে এসে বলত—

'বুজি...বৌদি কাঁদছে।'

'হায়।' বাবুজি বলে ওঠেন আর উঠে পড়ে আঁধারে সেইদিকে তাকিয়ে দেখেন যে-দিকে বধূর চারপাই রয়েছে। কিছুক্ষণ সেখানেই বসে থাকার পর তিনি ফের শুয়ে পড়েন আর কিছু বুঝে নিয়ে কুন্দনকে বলেন—'যা...তুই ঘুমিয়ে পড়, সে নিজে-নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে'।

তারপর শুয়ে পড়ে বাবু ধনীরাম পরামাত্মার পুষ্পশোভিত বাগান দেখতে থাকেন আর আপনার মনে ভগবানকে শুধোন—'রুপোর মতো এইসব খুলে-যাওয়া বন্ধ-যাওয়া ফুলের মধ্যে আমার ফুলটি কোথায়?' সারা আকাশ তাঁর কাছে এক বেদনার নদী-রূপে দেখা দেয় আর দু'কানে অনবরত হায়-হায় আওয়াজ বেজে ওঠে, তা শুনতে-শুনতে তিনি বলে ওঠেন—'যেদিন থেকে দুনিয়া তৈরি হয়েছে সেদিন থেকে মানুষ কত কেঁদেছে।'

ইন্দুর যাবার বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যেই মদন ঝামেলা শুরু করে দেয়। সে লিখল—'বাজারের রুটি খেতে-খেতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। কোষ্ঠাবদ্ধতা হয়েছে। তলপেটে বেদনা শুরু হয়েছে।' তারপর যেমনভাবে দফতরের লোক ছুটির জন্য সার্টিফিকেট পেশ করে তেমনভাবে মদন বাবুজির এক দোস্তের সমর্থন-প্রাপ্ত চিঠি লিখিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিল। তাতেও যখন কিছু হল না তখন এক ডবল তার—জবাবি টেলিগ্রাম।

জবাবি তারের পয়সা মারা গেল। কিন্তু তাতে কী। ইন্দু আর বাচ্চারা ফিরে এল। মদন দুদিন ইন্দুর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলেনি। ইন্দু খুব দুঃখ পেয়েছিল এতে। একদিন মদনকে একলা পেয়ে ধরে নিয়ে বসিয়ে বলেছিল—'এত মুখ ফুলিয়ে বসে আছ। আমি কী করেছি?'

মদন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—'ছাড়—দূর হয়ে যা হতচ্ছাড়ি, আমার চোখের সামনে থেকে...।'

'এই কথা বলার জন্যে এতদূর থেকে ডেকে নিয়ে এলে?'

'হ্যাঁ।'

'ছোড় এসব।'

'খবরদার—এ-সব তোমার তৈরি করা ঘটনা। তুমি যদি আসতে চাইতে তা হলে বাবুজি কি থামিয়ে দিত?'

ইন্দু বিহ্বলতার সঙ্গে বলল—'হায় জি, তুমি তো বাচ্চাদের মতো কথা বলছ। আমি নিজের থেকে কী করে ওকে এ কথা বলি? সত্যি কথা জানতে চাও তো বলি, আমাকে ডেকে নিয়ে এসে তুমি বাবুজির ওপর বড় জুলুম করলে।'

'মতলবটা কী?'

'মতলব কিছু নেই—বাচ্চাদের প্রতি ওঁর হৃদয়ের খুব আসক্তি জন্মেছিল...।'

'আর আমার হৃদয়?'

'তোমার হৃদয়? তুমি তো কোথাও আসক্তি জন্মাতে পার।' ইন্দু বদমায়েশি করে বলল আর মদনের প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে দেখল যে, ইন্দুর কাছ থেকে মদনের নিজেকে দূরে রাখার সব ক্ষমতাই শেষ হয়ে গেল। সে-ও কোনো নিপুণ ছলের খোঁজে ছিল।

সে ইন্দুকে ধরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল—'বাবুজি তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ইন্দু বলল—'একদিন আমি জেগে দেখি শিয়রে দাঁড়িয়ে উনি আমাকে দেখছেন।'

'এ হতে পারে না।'

'আমি কসম খেয়ে বলছি।'

'নিজের না, আমার কসল খেয়ে বল।'

'তোমার কসম তো আমি খাই না...অন্যেরা খেলে খাক।'

'হ্যাঁ', মদন ভেবে বলল—'বইতে একে বলে সেক্স।'

'সেক্স?' ইন্দু শুধাল—'সেটা কী ব্যাপার?'

'ওই ব্যাপার যা পুরুষ আর মেয়েমানুষের মধ্যে হয়।'

'হায় রাম!' ইন্দু একদম পিছু হটে গিয়ে বলল—'নোংরা কোথাকার। বাবুজির সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে পার, তোমার লজ্জা হয় না?'

'তোমাকে দেখতে বাবুজির লজ্জা হয় না?'

'কেন?' ইন্দু বাবুজির পক্ষ নিয়ে বলল—'তিনি নিজের পুত্রবধূকে দেখে খুশি হয়েছিলেন।'

'কেন নয়? যখন তোমার মতো সুন্দরী পুত্রবধূ?'

'তোমার মন নোংরা', ইন্দু ঘৃণার সঙ্গে বলল—'এই কারণে তো তোমার কারবারও হল দুর্গন্ধ বিরোজার। তোমার বইপত্র সব দুর্গন্ধে ভরা। তুমি আর তোমার বইপত্র—এছাড়া আর কিছু দেখতে পার না। আমি যখন বড় হয়ে গেলাম তখন আমার বাবা আমাকে অনেক বেশি আদর করতে শুরু করেছিলেন। তা হলে কি তিনিও...ছিলেন সেই হতভাগা যার নাম তুমি এখনি নিচ্ছিলে।' ইন্দু ফের বলল—'বাবুজিকে এখানে আনিয়ে নাও। ওখানে তাঁর ভালো লাগছে না। তিনি দুঃখী হলে তুমি কি দুঃখী হবে না?'

মদন তার বাবাকে খুবই ভালোবাসত। সংসারে মায়ের মৃত্যুর পর মদনের বড় হবার পেছনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব তাঁরই ছিল। সে-কথা মদন ভালো রকমই জানে। মায়ের রোগের শুরু থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছু যখনি মদনের মনে পড়ে যেত তখনি সে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করে দিত—'ওম্ নম ভগবতে বাসুদেবায়, ওম্ নম...।' এখন সে চাইছিল না বাপের ছত্রছায়া তার মাথার ওপর থেকে সরে যায়। বিশেষত এই কারণে যে সে এখন পর্যন্ত তার কারবার জমাতে পারেনি। সে অবিশ্বাসের কণ্ঠে ইন্দুকে কেবল এ-কথাই বলেছিল—'এখন বাবুজিকে ওখানেই থাকতে দাও। বিয়ের পর এই প্রথম আমরা দুজনে খুশিমতো এক সঙ্গে মিলতে পেরেছি।'

তৃতীয়-চতুর্থ দিনে বাবুজির অশ্রুসিক্ত চিঠি এল। 'আমার স্নেহের মদন' সম্বোধনে 'আমার স্নেহের' শব্দ চোখের জলে ধুয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন—'বউমা এখানে থাকায় আমার পুরনো দিনগুলো ফিরে এসেছিল—তোমার মায়ের দিন, যখন আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছিল তখন সে-ও ওই রকম বেপরোয়া ছিল। এইভাবেই ছেড়ে-ফেলা কাপড় এদিকে-ওদিকে ফেলে দিত আর আমার পিতাজি তা গুছিয়ে তুলতেন। সেই তো মদনের সিন্দুক, সেই তো হাজার শান্তি...আমি বাজারে যাই, কিছু নয় তো দইবড়া আর রাবড়ি কিনে নিয়ে আসি। এখন ঘরে কেউ নেই। যেখানে চন্দনকাঠের সিন্দুক ছিল সে জায়গা খালি পড়ে আছে...।' তারপর এক-আধ ছত্র ফের ধুয়ে গেছে। শেষে লিখেছেন—'দফতর থেকে এখানকার বড়-বড় আঁধার কামরায় ফিরে এলে আমার মনের মধ্যে বমির মতো ভাব ওঠে...আর—বৌমার যত্ন কর। তাকে কোনো যে-সে দাইয়ের হাতে সঁপে দিও না।'

ইন্দু দুই হাতে চিঠি টেনে নিল। দম নিয়ে চোখ টান করে, লজ্জায় গলে যেতে-যেতে বলল—'আমি মরে গেলাম। বাবুজি কী করে বুঝতে পারলেন?'

মদন চিঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—'বাবুজি কি বাচ্চা ছেলে? দুনিয়া দেখেছেন, আমাদের জন্ম দিয়েছেন...'

'হ্যাঁ।' ইন্দু বলল—'এখন কত দিনই-বা হল?'

তারপর সে পেটের ওপর তীক্ষ্ণভাবে নজর দেয়। এখনো বাড়তে শুরুই করেনি, কিন্তু এর মধ্যেই বাবুজি আর কোনো-কোনো মানুষ তা দেখতে পেয়েছে। সে তার শাড়ির আঁচল পেটের ওপর টেনে নিয়ে কিছু ভাবতে থাকে। তার দেহে এক চমক, সে বলে—'তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে রনি আসবে।'

'আমার শ্বশুরবাড়ি?...ও হ্যাঁ।' মদন পথ খুঁজে পেয়ে বলল—'কী লজ্জার কথা! এই ছ-আট মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই চলে এল'—আর হেসে ইন্দুর পেটের দিকে ইশারা করল।

'চলে এসেছে, না তুমি নিয়ে এসেছ?'

'তুমি...সব অপরাধ তোমার। কিছু, কিছু মেয়েছেলে এরকমই হয়ে থাকে...।'

'তোমার পছন্দ নয়?'

'একেবারে নয়।'

'কেন?'

'জীবনের কয়েক দিন তো মজা করে নেয়া যাক।'

'কেন এ বুঝি জীবনের মজা নয়।' ইন্দু দুঃখভরা কণ্ঠে বলল—'পুরুষমানুষ বিয়ে করে কিসের জন্যে? ভগবানের কাছে বিনা প্রার্থনায় তিনি দিয়েছেন বলেই তোমার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? যার ছেলেপুলে হয় না তাকে শুধাও। সে কী না করে? পীর-ফকিরের কাছে যায়। সমাধি, মাজারের ওপর পিপড়া খাওয়ায়, লজ্জা-হায়া ছেড়ে, নদীর তীরে উলঙ্গ হয়ে শরডাঁটা কাটে, শ্মশানে মশান জাগায়...'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' মদন বলল—'তুমি তো ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে...জীবন কি কেবল বাচ্চার জন্যই?'

'ও যখন আসবে,' ইন্দু বিষণ্নভাবে আঙুল তুলে বলল—'তখন তুমি তাকে ছোঁবে না। সে তোমার নয়, আমার হবে। তোমার তাকে দরকার নেই, কিন্তু তার ঠাকুরদাদার খুব দরকার আছে। এ-কথা আমি জানি...।'

আবার কিছুটা শান্ত, কিছুটা দুঃখিত হয়ে ইন্দু দুই হাতে তার মুখ ঢাকল। সে ভাবছিল যে, তার পেটের মধ্যে এই ছোট্ট প্রাণটিকে পালনের ব্যাপারে তার আপন লোক কেউ থাকলে কিছুটা দরদের সঙ্গে তাকে দেখবে। কিন্তু মদন বসেছিল চুপচাপ। তার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরল না। ইন্দু মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মদনের দিকে তাকিয়ে দেখল আর ভাবী প্রথম সন্তানবতীর ঢঙে বলল—'যা-কিছু বলেছি তা তো পরে হবে, তার আগে দেখ, আমি তো আর বাঁচব না...ছোটবেলা থেকেই এ-কথা আমার মনে হয়...'

মদন ভয় পেয়ে গেল। এই 'সুন্দর চিজ' গর্ভবতী হবার পর আরো সুন্দর হয়েছে—এ মরে যাবে? সে পিছন দিক থেকে ইন্দুকে ধরে নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে এসে বলল—

'তোমার কিছু হবে না ইন্দু...তোমাকে আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব...এখন সাবিত্রী নয়...সত্যবানেরই সাধনা—'

মদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ইন্দু ভুলে গেল তার নিজের কোনো দুঃখ আছে...

তারপরে বাবুজি আর কোনো চিঠি লেখেননি। হঠাৎ সাহারানপুর থেকে এক সর্টার এল। সে কেবল এ কথাই জানাল যে, বাবুজির ফের হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। এক আক্রমণে তিনি প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। মদন ভয় পেয়ে গেল। কাঁদতে লাগল ইন্দু। সর্টার চলে যাবার পরে কিছুক্ষণ পরপরই মদন চোখ বুজে মনে-মনে পড়তে থাকে—'ওম নম ভগবতে...' পরের দিন মদন বাপকে চিঠি লিখল—'বাবুজি চলে আসুন। বাচ্চারা আপনার কথা খুব মনে করে, আপনার বৌমাও—', কিন্তু চাকরি তো আছে। আসাটা কি নিজের আয়ত্তে ছিল তাঁর? ধনীরামের পত্র অনুসারে সে ছুটির বন্দোবস্ত করছিল। তাঁর ব্যাপারে মদনের অপরাধবোধ বাড়তে শুরু করল। 'আমি যদি ইন্দুকে থাকতে দিতাম তা হলে আমার কী ক্ষতি হত?'

বিজয়া দশমীর আগের রাতে মদন ছটফট করতে-করতে মাঝের কামরার বাইরে বারান্দায় টহল দিচ্ছিল। তখনি ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ এল আর সে চমকে উঠে দরজার দিকে দৌড়াল। বেগম দাই বাইরে এসে বলল—

'বাবুজি খুশি হও...ছেলে হয়েছে।'

'ছেলে?' মদন বলল। উদ্বেগের স্বরে ফের জিজ্ঞেস করল—'বউ কেমন আছে?'

বেগম বলল—'ভগবানের দয়ায় ভালো আছে। এখন পর্যন্ত প্রসূতিকে ভালো রেখেছেন। পেটের ছেলে বেশি খুশি হয়ে গেলে ওর পেটের ফুল পড়ত না...'

'ও।' মদন বোকার মতো চোখ মিটকে বলল, আবার কামরার দিকে যাবার জন্যে এগোল। বেগম ওকে সেখানেই থামিয়ে দিয়ে বলল—'অন্দরে তোমার কী কাজ?' তারপর হঠাৎ দরজা বন্ধ করে চট করে ভিতরে চলে গেল।

তখন পর্যন্ত মদনের পা কাঁপছিল। ভয়ের জন্য নয়, সান্ত্বনায়, আর বোধহয় এজন্য যে, এই দুনিয়ায় কোনো আগন্তুক এলে আশেপাশের লোকের এই অবস্থাই হয়। মদন শুনেছিল যখন ছেলে হয় তখন ঘরের দরজা আর দেয়াল কাঁপে। তখন ভয় হয় যে বড় হয়ে ওই ছেলে আমাকে বেচে দেবে, না রাখবে। মদন অনুভব করল যেন সত্যিসত্যি দেয়ালগুলো কাঁপছে। সূতিকাঘরে চকলি-বৌদি আসেনি, কারণ তার নিজের বাচ্চা খুবই ছোট ছিল। হাঁ, দরিয়াবাদী পিসি অবশ্যই পৌঁছেছিল। বাচ্চার জন্মের সময় সে রাম-রাম রাম-রাম রটনা করতে লাগল। আস্তে-আস্তে সে শব্দও ক্ষীণ হয়ে আসে।

সারা জীবনে আর কখনো মদনের এমন ব্যর্থ আর বেকার বলে মনে হয়নি নিজেকে। এর মধ্যে ফের দরজা খুলে পিসি বেরিয়ে এসেছিল। বারান্দায় বিজলিবাতির মৃদু আলোয় তাকে ভূতের চেহারার মতো একদম দুধ-শাদা দেখাচ্ছিল। মদন তার পথ আগলে বলল—'পিসি, ইন্দু ঠিক আছে, না?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পিসি তিন-চারবার বলে নিজের কম্পিত হাত মদনের মাথায় রেখে তাকে নামিয়ে আনল, চুমু খেল আর বাইরে চলে গেল দ্রুত।

বারান্দার দরজা থেকে পিসিকে বাইরে যেতে দেখা গেল। সে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখল বাচ্চারা ঘুমিয়েছে। পিসি এক-এক করে প্রত্যেকের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে ছাদের দিকে চোখ তুলে কিছু বলল, তারপর শ্রান্ত হয়ে খুকির পাশে শুয়ে পড়ল। তার দুটি ঠোঁটের

ওঠা-নামা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, সে কেমন করে কাঁদছে...মদন বিস্মিত হল...পিসি তো অনেক জায়গায় দিন কাটিয়েছে, তবে কেন আজ তার আত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠছে?

ওদিকের কামরা থেকে ধূনোর গন্ধ এসে ছেয়ে ফেলে মদনকে। বেগম দাই কাপড়ে কিছু জড়িয়ে নিয়ে বাইরে আসে। তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় মদন। তার খেয়াল ছিল না সে কোথায় রয়েছে। দু চোখ খুলে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এর মধ্যে ইন্দুর এক মরার মতো আর্তনাদ ভেসে এল—'হা...য়'। আবার বাচ্চার কান্নার শব্দ।

তিন-চার দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটল। মদন ঘরের এক দিকে গর্ত খুঁড়ে ফুল পুঁতে ফেলল। অন্দরে কুকুরগুলোকে বাধা দিল আসতে। কিন্তু তার কিছুই খেয়াল ছিল না। তার মনে হয়েছিল ধূনোর গন্ধ মাথায় ঢুকে যাবার পর আজই তার হুঁশ ফিরে এসেছে। কামরায় একা সে আর ছিল ইন্দু, নন্দ আর যশোদা—আর অন্যদিকে ছিল নন্দলাল...ইন্দু বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখে জানবার চেষ্টায় বলল—'একেবারে ঠিক তোমার মতোই হয়েছে...'

'হতে পারে।' মদন বাচ্চার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল—'আমি তো বলছি এ হল ভগবানের দয়া। তুমি বেঁচে গেছ।'

'হ্যাঁ', ইন্দু বলল—'আমি তা বুঝেছি...'

'শুভ-শুভ বল', মদন একদম ইন্দুর কথা কেটে দিয়ে বলল—'এখানে যা-কিছু হবার হয়েছে, আমি তো তোমার কাছে আসব না।' একথা বলে মদন দাঁতের তলায় কথা চেপে নিল।

'চুপ কর।' ইন্দু বলল।

মদন তা শুনে দু হাতে কান চেপে ধরল আর ইন্দু হাসতে লাগল হালকা আওয়াজে।

ছেলে হবার পর কয়েকদিন পর্যন্ত ইন্দুর নাভি ঠিক জায়গায় আসেনি। সে ফিরে-ফিরে ওই বাচ্চার এমন তদারকি করছিল যে, এর পরে ও বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে নিজের আসল মাকে ভুলে গিয়েছিল।

এখন সবকিছু ঠিকঠাক। ইন্দু শান্তির সঙ্গে চারদিকে চোখ তুলে তাকায়। মনে হয়েছিল সে কেবল মদনের নয়, দুনিয়াভর সকল অপরাধীকে মাফ করে দিয়েছে, আর লোকের ভালো হবার ওষুধ আর করুণা বিতরণ করছে। মদন ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—এই সব রক্তস্রাবের পর ইন্দু কিছু দুর্বল হয়ে গিয়ে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ ইন্দু দু হাত নিজের বুকের উপর রাখল।

'কী হল?' মদন শুধায়।

'কিছু না।' ইন্দু কিছুটা উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল—'ওর খিদে পেয়েছে।' বাচ্চার দিকে ইশারা করল ইন্দু।

'এর—খিদে?'—মদন একবার বাচ্চার দিকে দেখে ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি কী করে জানলে?'

'দেখছ না', ইন্দু নিচের দিকে নজর রেখে বলল—'সব ভিজে গেল।'

মদন সতর্কভাবে ইন্দুর ঢিলে-ঢালা বুকের দিকে তাকাল। দুটি স্তনই দুধে ভরে আছে, আর গন্ধ আসছে। ইন্দু বাচ্চার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—'ওকে আমার কাছে দিয়ে দাও।'

মদন কড়াইয়ের আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে তার তাপ নিল। তারপর কিছুটা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে বাচ্চাকে তুলে নিল যেন একটা মরা ইঁদুর। শেষ পর্যন্ত ইন্দুর কোলে বাচ্চাকে তুলে দিল। ইন্দু মদনের দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি বাইরে যাও!'

'কেন? বাইরে কেন যাব?' মদন জিজ্ঞেস করে।

'যাও না...' ইন্দু কিছু গর্বের সঙ্গে, কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল—'তোমার সামনে আমি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারব না।'

'আরে!' মদনের বিস্ময় কণ্ঠে—'আমার সামনে খাওয়াতে পারবে না?' তারপর অবুঝভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সে আবার ইন্দুর দিকে তাকাল—আজ পর্যন্ত ইন্দুকে এত সুন্দর লাগেনি।

বাবু ধনীরাম ছুটিতে বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁকে আগের তুলনায় আধখানা দেখাচ্ছিল। ইন্দু তাঁর কোলে বাচ্চাকে তুলে দিলে উনি খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর পেটের ভিতর এমন এক ফোঁড়া হয়েছিল যা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে শূলের ওপর চড়িয়ে রাখত। যদি বাচ্চা না-থাকত তবে বাবুজির দশগুণ বেশি খারাপ অবস্থা হত।

কয়েকবার চিকিৎসা করা হল। শেষ চিকিৎসায় ডাক্তার বাবুজিকে আধ আনা মাপের পনেরো-বিশটা গুলি রোজ খেতে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনই তাঁর এত ঘাম হয়েছিল যে, দিনে তিন-চারবার কাপড় বদলাতে হত। প্রতিবার মদন কাপড় খুলে নিয়ে বালতিতে নিঙড়াত। কেবল ঘামেই বালতির এক-চতুর্থাংশ ভরে যেত। রাতে তাঁর বমি-বমি ভাব হল আর তিনি চিৎকার করে বললেন—'বউমা, একটা দাঁতন দাও। জিভের স্বাদ বড় খারাপ লাগছে।' বউমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁতন নিয়ে এল। বাবুজি উঠে দাঁতন চিবোতে শুরু করলেন, এমন সময় বমি এল, বমির সঙ্গে রক্তও এল। তাড়াতাড়ি তাঁকে শিয়রের দিকে শুইয়ে দেয়া হল। তাঁর চোখের মণি উল্টে গেল। আর কয়েকবার দমকের পরেই তিনি আকাশের ফুলবাগানে পৌঁছে গেলেন, সেখানে তিনি নিজের ফুলটি চিনে নিয়েছিলেন।

বাচ্চার জন্ম হবার পর মোটে বিশ-পঁচিশ দিন হয়েছে। ইন্দু মুখ চাপড়ে কপাল আর বুক চাপড়ে বিবর্ণ করে তুলল নিজেকে। মদনের চোখের সামনে ছিল সেই দৃশ্য—যা রোজ তার খেয়ালে নিজের মৃত্যুর পরের দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। তফাত এই ছিল যে, ইন্দু চুড়ি ভেঙে ফেলার বদলে খুলে রেখে দিয়েছিল। মাথায় ছাই দেয়নি। কিন্তু জমিতে আছড়ে পড়ে সারা শরীরে মাটি লেগে যাওয়ায় আর চুল ছড়িয়ে পড়ায় চেহারা ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল ইন্দুর। 'সবাই দেখ আমি সব হারিয়েছি'-র বদলে 'সবাই দেখ আমরা সব হারিয়েছি'—

ঘরের বাইরের কত বোঝা তার ওপর এসে পড়েছিল, তার পুরো আন্দাজ মদনের ছিল না। সবাক থেকেই তার হৃৎপিণ্ড এক লাফে মুখে এসে গিয়েছিল। সে বোধহয় বাঁচতে পারত না যদি সে ঘরের বাইরে নালার ধারে ভিজে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের হৃদয় নিজের জায়গায় নিয়ে না আসত। ছোট বাচ্চা কুন্দন, খুকি দুলারি আর পাশী এমনই চেঁচাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল পাখির বাসায় শিক্‌রে বাজের আক্রমণে পাখির ছানাগুলো ঠোঁট তুলে চিঁ-চিঁ করছে। যদি কেউ তাদের পাখার নিচে সামলে রাখতে পারে তো সে ইন্দু—নালার ধারে পড়ে থেকে মদন ভাবছিল, এখন তো আমার কাছে এ দুনিয়া শেষ হয়ে গেল। কী, আমি কি আর বাঁচতে পারব? জীবনে আর কোনোদিন হাসতে পারব? সে উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

সিঁড়ির নিচে ছিল স্নানের ঘর। সেখানে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে-করতে মদন ফের একবার এই কথা মনে-মনে আওড়াল : আমি আর কখনো হাসতে পারব?—আর সে খিলখিল করে হাসছিল, যদিও তার বাপের মৃতদেহ তখন পর্যন্ত বৈঠকখানায় পড়ে ছিল।

বাপকে আগুনে সঁপে দেয়ার আগে মদন মেজের উপর পড়ে থাকা মৃতদেহের সামনে দণ্ডবতের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়েছিল। তার জন্মদাতার কাছে এই ছিল তার শেষ প্রণাম, তখন সে আর কাঁদল না। তার এই অবস্থা দেখে শোকের অংশীদার সব আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হিন্দু প্রথা অনুসারে সর্বজ্যেষ্ঠ হবার কারণে মদনকেই চিতায় আগুন দিতে হল। জ্বলন্ত মাথার উপর কপাল-ক্রিয়ার লাঠি মারতে হল। মেয়েছেলেরা বাইরে শ্মশানের কূপের জলে স্নান করে ঘরে ফিরে গেল। যখন মদন ঘরে পৌছল তখন সে কাঁপছিল। ধরিত্রী-জননী কিছুক্ষণের জন্য যে শক্তি আপন সন্তানকে দিয়েছিলেন রাত এসে যাবার পর তা বিক্ষিপ্ততায় অবসিত হয়ে গেল... তার কোনো সাহায্য প্রয়োজন ছিল। কোনো এক রকম ভাবনার অনুষঙ্গ যা মৃত্যুর চেয়েও বড়। ওই সময় ধরিত্রী-জননীর কন্যা জনকতনয়া ইন্দু যেন কোনো ঘড়া থেকে জন্ম নিয়ে ওই রামকে নিজের দু-বাহুর মধ্যে টেনে নিল। এ রাতে যদি ইন্দু আপন অস্তিত্ব মদনের ওপর উৎসর্গ করে না-দিত তবে এত বড় দুঃখ মদনকে ডুবিয়ে দিত নির্ঘাত।

দশ মাসের মধ্যেই ইন্দুর দ্বিতীয় সন্তান চলে এল। স্ত্রীকে এই নরকের আগুনে ঠেলে দিয়ে মদন নিজের দুঃখ ভুলে গেল। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে—আমি যদি বিয়ের পর বাবুজির কাছ থেকে ইন্দুকে ডেকে নিয়ে না-আসতাম তবে বোধহয় এত শীঘ্র তিনি মারা যেতেন না। কিন্তু সে বাপের মৃত্যুতে যে লোকসান হয়েছে তা পূরণ করার কাজে লেগে গিয়েছিল। আগে অযত্নের ফলে কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এ বিষয়ে মদনের বিবশতা চলে গেল।

একদিন বড় ছেলেকে মদনের কাছে রেখে দিয়ে ছোট বাচ্চাকে বুকে নিয়ে ইন্দু বাপের বাড়ি গেল। পরে মুন্না বারবার জিদ করলে মদন কখনো তা মেনে নিত, কখনো নিত না। বাপের বাড়ি থেকে ইন্দুর চিঠি এল—'আমার এখানে ছেলের কান্নার আওয়াজ আসছে। ওকে কেউ মারে না তো...?' মদন বড় বিস্মিত হল, এক মূর্খ অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ... এরকম কথা কী করে লিখতে পারে? ফের সে নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিল—'এ-ও বোধহয় কোনো মুখস্থ-করা কথা।'

এভাবে এক বছর কাটল। কখনো এত আয় হয়নি যে তা দিয়ে কোনো আয়েশ করা যেতে পারে। কিন্তু সংসার-নির্বাহের মতো আয় নিশ্চয়ই হয়ে যেত। কষ্ট হত তখনি যখন কোনো বড় খরচ সামনে দেখা দিত। ...কুন্দনকে স্কুলে ভর্তি করানো আছে, দুলারি- মুন্নিকে ভালো দিন দেখে পাঠানো হয়েছে। ওই সময় মদন মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকত, আর ইন্দু একদিক থেকে এসে মুচকি হেসে বলত—কেন দুঃখ করছ? মদন তার দিকে আশাভরা নজরে তাকিয়ে বলত—'দুঃখী হবে না? কুন্দনের বি এ ক্লাশে ভর্তি করানো আছে ...মুন্নি ...' ইন্দু ফের হেসে বলত, 'চল আমার সঙ্গে'—আর মদন ভেড়ার বাচ্চার মতো ইন্দুর পিছনে পেছনে চন্দনের সিন্দুক পর্যন্ত যেত। ওই সিন্দুকে মদন সমেত

কারুরই হাত দেয়ার অনুমতি ছিল না। কখনো কখনো এই বিষয়ে ক্ষেপে গিয়ে মদন বলত—'মরবে তো ওই সিন্দুক বুকে করে নিয়ে যাবে', ইন্দু বলত—'হাঁ, নিয়ে যাব।' তারপর ওই সিন্দুক থেকে প্রয়োজন মতো অর্থ বার করে রাখত সামনে।

'এ টাকা কোথা থেকে এল?'

'কোথাও-না-কোথাও থেকে এসেছে...তোমার আম খাওয়ার মতলব আছে কি...'

'তারপর?'

আর যখন মদন বেশি জিদ করত তখন ইন্দু বলত—'আমি এক শেঠকে বন্ধু বানিয়েছি না...' বলে হাসতে শুরু করত। একথা মিথ্যা জেনেও মদনের এই মজা ভালো লাগত না। ইন্দু ফের বলত—'আমি চোর-ডাকাত ...তুমি জানো না, খুব বড় ডাকাত—যে এক হাতে লুঠ করে আর অন্য হাতে গরিব-গুর্বোকে দিয়ে দেয়...' এই ভাবেই মুন্নির বিয়ে হয়ে গেল—এই বিয়েতে এই রকমই লুটের গয়না বিক্রি হয়ে গেল। ঋণ হল, আবার তা শোধও হয়ে গেল।

এইভাবেই কুন্দনের বিয়ে হয়ে গেল। এইসব বিয়েতে ইন্দু স্ত্রী-আচার পালন করত আর মায়ের ভূমিকায় দাঁড়াত। আকাশ থেকে বাবুজি আর মা দেখতেন ও পুষ্প-বৃষ্টি করতেন, যা কারুর নজরে আসত না। তারপর হল কী স্বর্গে মা-জি আর বাবুজির মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। মা বাবুজিকে বললেন—'তুমি বউয়ের হাতের রান্না খেয়ে এসেছ, ওর সুখও দেখে এসেছ, আর আমি পোড়াকপালী কিছুই দেখিনি'—আর এই ঝগড়া বিষ্ণু ও শিবের কাছে পৌছল। তাঁরা মায়ের পক্ষে রায় দিলেন—আর মা এই মৃত্যুলোকে এসে বউয়ের কোলে আশ্রয় নিলেন—আর এখানে ইন্দুর একটি মেয়ে হল। ...

অবশ্য ইন্দু এই ধরনের দেবী ছিল না। যখন কোনো সিদ্ধান্তের কথা হত, ননদ-দেবর তো কী, খোদ মদনের সঙ্গেই ঝগড়া করত—মদন সত্যনিষ্ঠার এই পুতুলের ওপর রাগ করে তাকে ডাকত হরিশচন্দ্রের বেটি। ইন্দুর কথায় প্যাঁচ সত্ত্বেও সত্য আর ধর্ম দৃঢ়ভাবে থাকে বলে মদন আর পরিবারের বাকি সব লোকের দৃষ্টি ইন্দুর সামনে নোয়ানো থাকত। ঝগড়া বেড়ে গেলে, মদন স্বামী হবার গর্বে ইন্দুর কত কথাই রদ করে দিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই শির ঝুঁকিয়ে ইন্দুরই শরণ নিত আর তার কাছে ক্ষমা চাইত।

নতুন-বউদি এলেন। বলতে হলে তিনিও বিবি ছিলেন, কিন্তু ইন্দুকেই সকলে বলত বিবি। ছোটবউদি রানিকে সকলে বলত কনে-বউ। রানির কারণে ভাইদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে জে. পি. খুড়োর মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল—যার মধ্যে একদিকে মা-বাপের সম্পত্তি আর অন্যদিকে ইন্দুর নিজের তৈরি জিনিসপত্র সব বিক্রি হয়ে গেলে ইন্দুর বুকে প্রবল আঘাত লেগেছিল।

সব-কিছু পেয়ে যাবার পর আর আলাদা হয়ে গিয়েও কুন্দন আর রানি ঠিকমতো সংসার পাততে না-পারায় ইন্দুর নিজের ঘর কিছুদিনের জন্য জমজমাট হয়ে থাকত।

মেয়েটার জন্মের পর ইন্দুর স্বাস্থ্য আগের মতো ছিল না। মেয়েটা সবসময় ইন্দুর বুকে লেগে থাকত। যখন সবাই ওই মাংসপিণ্ডের ওপর থু-থু করছিল তখন এক ইন্দুই তাকে বুকে নিয়ে ঘুরত, কিন্তু কখনো-কখনো নিজেও শ্রান্ত হয়ে মেয়েটাকে সামনের দোলনায় ফেলে দিয়ে বলত—'তুই আমাকে বাঁচতে দিবি কিনা?'

বাচ্চা মেয়ে আরো চেঁচিয়ে উঠত।

মদন ইন্দুকে এড়িয়ে যেত ইদানীং। বিয়ের থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মদন সেই নারী পায়নি যার সন্ধান সে করছিল। দুর্গন্ধ বিরোজা বেশ বিক্রি হচ্ছিল আর ইন্দুর অজ্ঞাতে মদন অনেক টাকা বাইরে-বাইরে খরচ করতে শুরু করেছিল। বাবুজির মৃত্যুর পর জিজ্ঞেস করার মতো কেউ ছিল না। পুরো স্বাধীনতা ছিল মদনের।

পড়শি সিব্‌তের মোষ ফের মদনের মুখের কাছে ফোঁস-ফোঁস শুরু করে। বিয়ের রাতের সেই মোষ তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মালিক ছিল বেঁচে। তার সঙ্গে এমন সব জায়গায় যেতে শুরু করেছিল যেখানে আলো আর ছায়া আজব কায়দার মূর্তি বানাত। কোণের দিকে কখনো আঁধারের ত্রিকোণ তৈরি হত, আবার ওপরে ফট করে আলোর এক চৌকোণ এসে কেটে দিত তাকে। কোনো ছবিই পুরো তৈরি হত না। মনে হত পাশ থেকে এক পাজামা বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে উড়ে গেল। কোনো একটা কোট দর্শকের মুখ পুরোপুরি ঢেকে দিত। যদি কেউ শ্বাস নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে তখনি আলোর চৌকোণ এক চৌখুপি হয়ে যেত আর তার মধ্যে এক মূর্তি এসে দাঁড়িয়ে যেত। দর্শক যদি হাত বাড়ায় তবে সে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, আর সেখানে তখন কিছুই থাকে না। পিছনে কোনো কুকুর কাঁদতে থাকে। উপরে তবলার আওয়াজ ওই কান্নাকে ডুবিয়ে দেয় ...

মদন তার কল্পনার আকৃতি পেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতে মনে হত কোথায় যেন শিল্পীর এক ত্রুটিপূর্ণ রেখা রয়ে গেছে। আর হাসির আওয়াজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত, মদন নিখুঁত শিল্পগত ভারসাম্যযুক্ত হাসির খোঁজে হারিয়ে যেত।

ওই বিষয়ে সিব্‌তে নিজের বিবির সঙ্গে কথা বলেছিল। তার বেগম মদনকে আদর্শ স্বামীরূপে পেশ করেছিল সিব্‌তের সামনে। কেবল পেশ করেনি, বরং মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। তাকে (ঐ আদর্শকে) তুলে নিয়ে সিব্‌তেও তার বেগমের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। মনে হচ্ছিল তা কোনো তরমুজের ভিতরের অংশ—তার সূতোগুলো বেগমের নাক, চোখ, কানের ওপর লেগে গিয়েছিল। বিস্তর গাল দিতে দিতে বেগম স্মৃতির টুকরি থেকে ওই সব ভিতরের অংশ আর বিচি তুলে নিয়ে ইন্দুর সাফসুতরো আঙিনায় দিয়েছিল ছড়িয়ে।

এক ইন্দুর বদলে দুই ইন্দু হয়ে গেল। এক তো ছিল ইন্দু নিজেই আর দ্বিতীয় হল এক কম্পিত রেখা—যা ইন্দুর পুরো শরীরে থাকে অথচ নজরে আসে না।

মদন কোথাও গেলে দোকান থেকে ফিরে এসে যেত...স্নান করে ভালো কাপড় পরে, খুশবুদার কিমাম-দেয়া এক জোড়া মঘাই পান মুখে রেখে,...কিন্তু ওই দিন মদন যখন ঘরে ফিরে এল তখন ইন্দুর চেহারাই ছিল অন্য রকম। সে তার মুখের ওপর পাউডার মেখেছিল। গালে লাগিয়েছিল রুজ। লিপস্টিক ছিল না বলে মাথার সিঁদুর দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়েছিল আর এমনভাবে চুল বেঁধেছিল যে, মদনের নজর তার মুখের ওপর আটকে গেল।

'আজ কী ব্যাপার?' মদন বিস্মিত।

'কিছু না।' ইন্দু মদনের নজর বাঁচিয়ে বলল—'আজ অবকাশ মিলেছে।'

বিয়ের পর পনেরো বছর কেটে যাবার পর ইন্দুর আজ অবকাশ মিলেছে আর তা-ও যখন তার মুখের ওপর ছায়া পড়েছে। নাকের ওপর এক কালির মতো রেখা আর ব্লাউজের নিচে উন্মুক্ত পেটের কাছে কোমরে চর্বির দু-তিনটে স্তর দেখা যাচ্ছে। আজ ইন্দু

এমন সাজগোজ করেছিল যাতে তার ত্রুটিগুলোর একটাও নজরে না-আসে। এইসব সাজ-গোজ, আঁটসাঁটভাবে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 'এ হতে পারে না'—মদন ভাবল আর এ-চিন্তা তাকে আঘাত করল। সে আরেকবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দুর দিকে—যেভাবে ঘোড়ার ব্যাপারি কোনো নামী ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখে। যেখানে যে গলদ ছিল মাতালের দৃষ্টিতে তা দেখা যাচ্ছিল না ...ইন্দু সত্যিসত্যি সুন্দরী। পনেরো বছর বাদে আজ ফুলো, রশিদা, মিসেস রবার্ট আর তার বোনেরা তার সামনে জল ভরে নিচ্ছে...মদনের মনে দয়া এল, আর এল ভয়।

আকাশে মেঘ ছিল না কিন্তু বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। ঘরের গঙ্গা বাড়তে শুরু করে তার জল কিনার ছাপিয়ে পুরো পার্বত্যভূমি আর পার্শ্ববর্তী বসতিগ্রাম আর শহরগুলোকে আপন গ্রাসের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই তীব্র গতিতে স্রোত প্রবাহিত হতে থাকলে কৈলাস পর্বতও ডুবে যাবে। ...এদিকে ছোট মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। এমন কান্না সে কাঁদেনি।

মদন তার কান্নার আওয়াজে দু চোখ বন্ধ করে আবার যখন খুলল তখন ছোট মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়েছিল—যুবতী হয়ে। না. না...ও তো ইন্দু। আপন মায়ের মেয়ে, আপন মেয়ের মা—সে তাকে চোখের কোণে মুচকি হাসি নিয়ে দেখল, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি নিয়ে দেখতে থাকল।

এই কামরায় ধুনোর ধোঁয়ায় একদিন মদনের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আজ ইন্দুর সাজগোজের সুগন্ধ তাকে পাগল করে দিল। হালকা বৃষ্টি ভারি বৃষ্টির চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে থাকে। এইজন্য বাইরের জল ওপরের কোনো কড়িতে পড়ে ইন্দু আর মদনের মাঝখানে টপ্‌টপ্ করে পড়তে শুরু করল ...কিন্তু মদন তো তখন মাতাল। এই নেশায় তার দু'চোখ ছোট হয়ে আসছিল আর শ্বাস পড়ছিল দ্রুত—যেন তা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস নয়।

'ইন্দু' মদন বলল ... তার কণ্ঠস্বর বিয়ের রাতের কণ্ঠস্বরের দুই গ্রাম ওপরে ছিল। ইন্দু দূরে চোখ মেলে বলল—'জি', আর তার আওয়াজ ছিল দুই গ্রাম নিচে ... আজ ছিল চাঁদনি রাতের বদলে অমাবস্যার রাত...

এর পরে মদন ইন্দুর দিকে হাত বাড়লে ইন্দু নিজেই মদনের সঙ্গে মিশে গেল। ফের মদন আপন হাতে ইন্দুর চিবুক তুলে ধরে দেখল, সে কী হারিয়েছে, কী পেয়েছে? ইন্দু মদনের কালী-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল ...'এ কী?' মদন চকিত হয়ে বলল—'তোমার দু চোখ ফুলে গেছে।'

'এমনিই'। ইন্দু ছোট মেয়ের দিকে ইশারা করে বলেছিল—'এই হতভাগী আমায় সারা রাত জাগিয়ে রেখেছে...'

মেয়েটা এখন চুপ করে আছে। মনে হচ্ছে দম নিয়ে দেখছে এখন কী হতে পারে? আকাশ থেকে জল পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মদন ফের সযত্নে ইন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—'হাঁ...কিন্তু এই অশ্রু?'

'খুশিতে।' ইন্দু জবাব দিয়েছিল—'আজকের রাত আমার'—ফের এক অদ্ভুত হাসি হেসে সে মদনকে আঁকড়ে ধরেছিল। কেমন এক আনন্দের অনুভূতিতে বলল মদন—আজ অনেক বছর পরে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, ইন্দু। আমি হামেশা চেয়েছিলাম—'

'কিন্তু তুমি তো বলনি।' ইন্দু বলল, 'মনে আছে, বিয়ের রাতে আমি তোমার কাছে কিছু চেয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ—মদন বলল—'তোমার দুঃখ আমাকে দাও।'

'তুমি তো আমার কাছে কিছু চাওনি।'

'আমি!' মদন বিস্মিত হয়ে বলল—'আমি কী চাইব? আমি যা কিছু চাইতে পারতাম সবই তুমি আমায় দিয়েছ। আমার আত্মীয়জনের প্রতি ভালোবাসা—তাদের লেখাপড়া, বিয়েশাদি—এইসব সুন্দর বাচ্চা—এইসব কিছুই তো তুমি দিয়েছ।'

'আমিও তো তাই বুঝতাম।' ইন্দু বলল—'কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি, এইসব নয়।'

'কী বলতে চাইছ?'

'কিছু না' ইন্দু থেমে গিয়ে ফের বলল—

'আমি একটা জিনিস রেখেছি।'

'কী জিনিস রেখেছ?'

ইন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—'আমার লজ্জা ...আমার খুশি ... ওই সময় তুমিও তো বলে দিতে পারতে ... তোমার সুখ আমাকে দাও ... তা হলে আমি ...'বলতে-বলতে ইন্দুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আর কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলল—'এখন তো আমার কাছে কিছুই রইল না।'

মদনের ধরা-হাত শিথিল হয়ে গেল। সে যেন মিশে গেল মাটিতে—এই অশিক্ষিত স্ত্রীলোক—এ কি কোনো মুখস্থ করা কথা—?

না তো ... এ তো এখনি তার সামনে জীবনের ভাঁটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন তো তার ওপর বারবার হাতুড়ি পড়ছে আর চারিদিকে উড়ছে আগুনের ফুল্‌কি ...।

কিছুক্ষণ পরে মদনের হুঁশ ফিরে এলে সে বলল—'আমি বুঝেছি ইন্দু।'

তারপর কাঁদতে-কাঁদতে মদন আর ইন্দু পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল। ইন্দু মদনের হাত ধরে তাকে এমন দুনিয়ায় নিয়ে গেল যেখানে মানুষ মরে গিয়েই পৌছতে পারে।

অনুবাদ : ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ঠাণ্ডা গোশ্‌ত

সাদত হাসান মান্টো

ঈশ্বরসিং হোটেলের কামরায় প্রবেশ করতেই, কুলবন্ত কাউর পালং থেকে উঠে দরজার খিল বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। রাত তখন ১২টা। সারা শহরে নীরবতা।

কিছুক্ষণ দেখে কুলবন্ত কাউর খাটের উপর ধপাস করে বসে পড়ে। ঈশ্বরসিং বিশ্রী এক চিন্তার ধকল থেকে মুক্তির চেষ্টা করছিল; কৃপাণ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক কোণে। কিছু সময় কেটে গেল, কুলবন্তের উপবেশনের আসন মনঃপুত হওয়ায় সে দু পা পালং-এর নিচের দিকে ঝুলিয়ে নাড়তে থাকে। তবুও ঈশ্বরসিং-এর মুখে কোনো রা নেই।

কুলবন্ত কাউর মোটাসোটা গড়নের মহিলা। উজ্জ্বল দুটি চোখ। উপরের ঠোঁটে হালকা গোঁফের রেখা। একটু পরখ করলেই বোঝা যায় বড়ই রাশভারি মহিলা। ঈশ্বরসিং মাথা নিচু করে এককোণে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার পাগড়ি খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হাতের মুষ্ঠিতে ধরে রাখা কৃপাণ ক্রমশ ঝুলে পড়ছে, অথচ তার দেহের গড়ন ও উচ্চতা দেখে মনে হয়, সে একজন সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক। কিছুক্ষণ এমনি নীরবতায় অতিক্রান্ত হয়। কুলবন্তের উজ্জ্বল নয়নযুগল নেচে ওঠে। নীরবতা ভঙ্গ করে কুলবন্ত তাকে ডাকে, 'ঈশ্বর সিয়াঁ।' ঈশ্বরসিং চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু কুলবন্তের তির্যক দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকা তার পক্ষে দুরূহ। তাই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কুলবন্ত চিৎকার করে উঠল, 'ঈশ্বর সিয়াঁ!' স্বরটা সামলে নিয়ে খাট থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?' ঈশ্বরসিং শুষ্কঠোঁটে জিহ্বা ঘষে নিয়ে উত্তর দেয়, 'আমি জানি না।' কুলবন্ত রেগে ওঠে, 'এটা কি কোনো জবাব হল?'

ঈশ্বরসিং কৃপাণ একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খাটে সটান শুয়ে পড়ে। তাকে দেখে মনে হয় সে অনেক দিন যাবত রোগে ভুগছে। কুলবন্ত খাটের দিকে তাকাল, সেখানে ঈশ্বরসিং শুয়ে ছিল। কুলবন্তের মনে সহানুভূতি ও আবেগের সঞ্চার হল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মায়াভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে 'তোমার কী হয়েছে বল তো।'

ঈশ্বরসিং ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর কুলবন্তের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে আর ডাকে, 'কুলবন্ত।' তার কণ্ঠ বিষাদভরা।

কুলবন্তের চোখে প্রেমের আবেগ ফুটে ওঠে, 'জী, বল', বলে সে সাড়া দেয়।

ঈশ্বরসিং পাগড়ি খুলে ফেলে। আশ্রয়কাতর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায়। মাংসল পেটে জোরে চড় মেরে, মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'মাথা বিগড়ে গেছে।' মাথায় ঝাঁকুনির ফলে তার চুলের খোঁপা খুলে যায়। কুলবন্ত হাতের আঙুলে স্বামীর চুল

আঁচড়াতে থাকে। এমনিভাবে স্বামীর চুলে আঙুল চালিয়ে প্রীতিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'ঈশ্বরসিং, এতদিন কোথায় ছিলে?' 'কবিরে', ঈশ্বরসিং কুলবন্ত কাউরকে ভীরু দৃষ্টিতে দেখতে থাকে এবং দু'হাতে তার দু বাহু জাপটে ধরে বলে, 'গুরুর দিব্যি, তুমি অত্যন্ত বাজে মেয়ে!'

কুলবন্ত কাউর এক পলকে ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমার দিব্যি, বল, কোথায় ছিলে, শহরে গিয়েছিলে?' ঈশ্বর চুলের খোঁপা তৈরি করতে গিয়ে উত্তর দেয়, 'কোথাও না।'

কুলবন্ত রেগে বলে, 'তুমি নিশ্চয় শহরে গিয়েছ, বহু টাকা লুট করেছ। এখন আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করছ।'

'বাপের জন্ম নই যদি তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলি।' কুলবন্ত চুপসে যায়। কিন্তু আবার হঠাৎ রেগে ওঠে, 'আমার বোধগম্য হচ্ছে না, সে রাতে তোমার কী হয়েছিল। বেশ ভালোই ছিলে। শহর থেকে লুণ্ঠিত সব অলঙ্কারপত্র আমার পরনে। হঠাৎ কি জানি তুমি উঠে দাঁড়ালে আর জামাকাপড় পড়ে কোথায় বেরিয়ে পড়লে।'

ঈশ্বরসিং-এর চেহারা ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। কুলবন্ত তার এই পরিবর্তন দেখে বলে, 'দেখলে, তোমার চেহারার রঙ কেমন পাল্টে গেল। ঈশ্বর সিয়াঁ, দিব্যি করে বলছি, নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে।'

'তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, সত্যিই কিছু হয়নি।' ঈশ্বরসিং-এর কণ্ঠ প্রাণহীন। কুলবন্তের সন্দেহ আরও সুদৃঢ় হয়, ঠোঁট কামড়িয়ে জোরের সঙ্গে বলে, 'ঈশ্বর সিয়াঁ, কী ব্যাপার বল তো, আটদিন আগে তুমি যেমন ছিলে এখন তো তেমন নেই।'

ঈশ্বরসিং উঠে বসে। যেন কেউ তাকে হামলা করেছে। কুলবন্তকে পাশে বসিয়ে বলে, 'কুলবন্ত আমার কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

কুলবন্তের অভিযোগ শেষ হয় না, বলে, 'তুমি সেদিন রাতে বাইরে কেন গিয়েছিলে? জাহান্নামে! বলছ-না কেন?'

'কিছু হলে তো বলব।'

'আমাকে নিজ হাতে পুড়িয়ে মার যদি মিথ্যে বল।'

ঈশ্বরসিং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে এবং মুখখানি কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি কী যেন বলে। গোঁফের কেশরাজি কুলবন্তের নাকে প্রবেশ করলে তার হাঁচি পায়। দুজনেই হেসে ওঠে।

ঈশ্বরসিং কুলবন্তকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে দেখতে থাকে; 'এখন অতীতের কথা ভুলে যাও।'

কুলবন্ত কাউরের উপরের ঠোঁটে শিশিরের মতো বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। এক বিচিত্র ভঙ্গিতে চোখের পুতলি ঘুরিয়ে বলে, 'চল সন্ধি করি।'

ঈশ্বরসিং তার সুডৌল বাহু ধরে জোরে চাপ দেয়। কুলবন্ত কাউর চটপট করে একদিকে সরে পড়ে, 'সরে যাও ঈশ্বর সিঁয়া। ব্যথা পাই।' ঈশ্বরসিং আবার কুলবন্ত কাউরকে পাকড়াও করে পাশে বসায় এবং মিষ্টি আলাপে তার হৃদয় কোমল করার চেষ্টা করে। কুলবন্ত এই তোশামোদে গলে মোম হয়ে যায়।

কুলবন্তের উপরের ঠোঁট মৃদু কাঁপছিল। ঈশ্বরসিং-এর মনে হিংস্রতা জেগে ওঠে। সজোরে তার বাহু ধরে কচলান দিয়ে বলে, 'কুলবন্ত গুরুজির দিব্যি করে বলছি, তুমি বড় ভালো।'

কুলবন্ত তার বাহুতে চাপ দেয়ার ফলে সৃষ্ট লাল দাগ দেখে বলল, 'তুমি বড্ড নিষ্ঠুর ঈশ্বর সিঁয়া।'

ঈশ্বরসিং ঘন কালো গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসে, 'তুমি কোনো অংশে কম নও।'

কুলবন্ত কাউর জ্বলন্ত আগুনে দেয়া কড়াইয়ের মতো জ্বলে ওঠে। অন্যদিকে ঈশ্বরসিং যেন কিসের ভাবনায় মগ্ন। সে কুলবন্তের উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলে যায়। কুলবন্ত নিচু গলায় বলে 'ঈশ্বর সিঁয়া, তুমি কোন জগতে বিচরণ করছ?'

এ-কথা শুনে ঈশ্বরসিং-এর ধ্যান ভাঙে, যেন হাত থেকে সব তাসগুলো ছিটকে পড়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দেখতে থাকে এদিক-ওদিক। তার মাথায় চুলের গোড়ায় ঘামের প্রলেপ দেখা দেয়। কুলবন্ত কাউর তাকে দৃষ্টি আকর্ষণের বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারপর খাট থেকে নিচে নেমে রেগে নাসাগ্র ফুলিয়ে বলে, 'ঈশ্বর সিঁয়া, কোন হারামজাদির কাছে তুমি এতদিন ছিলে, কে আমার বুক থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল?'

ঈশ্বরসিং পালঙ্কে শুয়ে হাই তোলে। কুলবন্ত কাউর রাগে গরগর করতে থাকে, 'আমি জিজ্ঞাসা করছি সে কে? কে?'

ঈশ্বরসিং প্রাণহীন কণ্ঠে উত্তর দেয় 'কেউ না, কুলবন্ত কেউ না।' কুলবন্ত কোমরে হাত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'ঈশ্বর সিঁয়া, আমি আজ সত্য-মিথ্যা যাচাই করবই। গুরুজির দিব্যি করে বল, তোমার কল্পনারাজ্যে কি কোনো নারীর ছবি নেই?'

ঈশ্বরসিং কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু কুলবন্ত তার সুযোগ না-দিয়েই গর্জন করে ওঠে, 'কসম খাওয়ার আগে ভেবে দেখ, আমিও সরদার নেহালসিং-এর মেয়ে। মিথ্যা বললে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলব। নাও, এবার গুরুজির কসম খাও...বলো তোমার চিন্তা-ভাবনা কোনো নারী নিয়ে কিনা?'

ঈশ্বরসিং বেদনার সঙ্গে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে। কুলবন্ত মুহূর্তের জন্য পাগল হয়ে যায়। লাফিয়ে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা কৃপাণ তুলে নেয় হাতে। কলার খোসার মতো কৃপাণের কভার ছুঁড়ে ফেলে ঈশ্বরের ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

তড়িৎ ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছোটে।

এতেও কুলবন্তের সাধ মেটে না। ঈশ্বরের চুলের জটা ধরে টানতে-টানতে অশ্লীল ভাষায় সেই অদৃশ্য নারীকে তিরস্কার করতে থাকে। ঈশ্বরসিং কিছুক্ষণ পর দুর্বল কণ্ঠে আবেদন জানায়, 'কুলবন্ত ওসব ভুলে যাও।' তার কণ্ঠে বেদনার অতলান্ত ছায়া। কুলবন্ত কাউর পেছনে সরে দাঁড়ায়। ঈশ্বরসিং-এর গলায় কৃপাণের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে তার গোঁফের ওপর এসে পড়েছে। রক্তাক্ত ঈশ্বরসিং কৃতজ্ঞতা ও অভিযোগের মিশ্রদৃষ্টিতে কুলবন্তের দিকে চোখ তুলে তাকায়; 'কুলবন্ত, তুমি এত তাড়াতাড়ি এমন কাজ করলে! যাক যা হওয়ার হয়ে গেছে।' কুলবন্ত আবার রেগে ওঠে, 'কিন্তু সে তোমার কোন আত্মীয়া বল?' এবার রক্ত ঈশ্বরসিং-এর মুখে এসে পড়ে। রক্তের স্বাদ জিহ্বায় অনুভব করে তার সারা দেহ শিউরে ওঠে। 'আর আমি ... আমি এই কৃপাণ দিয়ে ... ছয় জনকে খুন করেছি।' মনে-মনে উচ্চারণ করে ঈশ্বরসিং।

কুলবন্তের মাথায় শুধু দ্বিতীয় মহিলার ছবি, 'আমি জিজ্ঞেস করছি কে সেই হারামজাদি?' ঈশ্বরসিং-এর চোখ ঢুলুঢুলু করছিল। তার মুখ হালকা উজ্জ্বল দেখায়, সে কুলবন্তকে বলে, 'সেই নিষ্পাপকে তিরস্কার কর না।' কুলবন্ত চিৎকার করে ওঠে, 'আমি জানতে চাই, সে কে?'

ঈশ্বরসিং-এর গলার স্বর জড়িয়ে আসে, 'বলছি'। এরপর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে তাজা রক্ত দেখে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। 'মানুষও এক বিচিত্র জীব।'

কুলবন্ত তখনও তার উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল; 'ঈশ্বর সিঁয়া, তুমি কাজের কথা বল।' ঈশ্বরসিং রক্তাক্ত গোঁফের ফাঁকে আবার মুচকি হাসে, 'কাজের কথাই বলছি। আমার গলা ধরে আসছে—এখন ধীরে-ধীরে সব কথাই বলব।' কথা বলার সময় তার মাথায় চুলের গোড়ায় শীতল ঘামের প্রলেপ দেখা দেয়।

'কুলবন্ত, আমার প্রিয় ... আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, আমার কী হয়েছে? মানুষ এক বিচিত্র জীব। শহরে লুটতরাজের সময় আমিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। গহনাপত্র ও টাকা যা লুট করে এনেছি, সব তোমার হাতে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলিনি—।' ঈশ্বরসিং কাটা ঘায়ের ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। কুলবন্ত কাউরের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই—বরং রূঢ়কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে, 'কোন কথা?'

গোঁফে জমে যাওয়া রক্ত ফু দিয়ে অপসারণ করে ঈশ্বরসিং বলে, 'যে-বাড়িতে...আমি লুঠতরাজের মানসে প্রবেশ করেছিলাম...সেখানে সাতজন লোক ছিল। ছয়জনকে আমি খুন করি এই কৃপাণ দিয়ে; যেটা দিয়ে তুমি আমাকে ... বাদ দাও সে সব কথা ... শোনো ... একটি সুন্দরী মেয়ে ... তাকে তুলে আমি সঙ্গে নিয়ে আসি।'

কুলবন্ত কাউর নীরবে শুনতে থাকে। ঈশ্বরসিং আরেকবার ফুঁ দিয়ে গোঁফে জমাট রক্ত দূর করে বলে, 'কী বলব, দারুণ সুন্দরী মেয়েটি ...তাকেও হত্যা করতাম। কিন্তু হায় ...আমি তার রূপে মজে যাই।' কুলবন্ত শুনে বলে, 'হুঁ।' 'এবং আমি তাকে তুলে নিয়ে চলতে থাকি রাস্তায় ...কী জানি বলছিলাম? হ্যাঁ, রাস্তায় ...নদীর তীরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখি।' এ কথা বলতে বলতে ঈশ্বরসিং-এর গলা শুকিয়ে আসে।

কুলবন্ত ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলে, 'তারপর কী হল?'

ঈশ্বরসিং অতিকষ্টে ধীরকণ্ঠে বলে, কিন্তু...তার স্বর তলিয়ে যায়; কুলবন্ত কাউর ধমক দিয়ে বলে, 'তারপর কী হল?'

ঈশ্বরসিং তার বুজে আসা চোখ মেলে কুলবন্তের দিকে তাকায়; তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাগে থরথর করে কাঁপছে। 'আসলে সে...মরে গিয়েছিল, সেটা ছিল তার মৃত লাশ...যেন ঠাণ্ডা গোশ্‌ত...! কুলবন্ত আমাকে তোমার হাত ধরতে...দাও।'

কুলবন্ত কাউর নিজের হাত ঈশ্বরসিং-এর হাতে রাখে, তখন তার হাত বরফের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা, যেন ঠাণ্ডা গোশ্‌ত।

আনন্দী

গোলাম আব্বাস

মিউনিসিপ্যালিটির সভা বেশ জমেছে। হল লোকে পরিপূর্ণ। অন্যান্য দিনের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতিটি সদস্য আজ উপস্থিত রয়েছেন। আলোচনার বিষয়—শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বেশ্যাদেরকে শহর থেকে অপসারণ করা। কারণ, এরা মানবতা, সংস্কৃতি আর আভিজাত্যের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কলঙ্কের মতো বিরাজ করছে।

মিউনিসিপ্যালিটির একজন গম্ভীর সদস্য—যিনি নিজেকে দেশ আর জাতির খাঁটি খাদেম বলে দাবি করেন—অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় বললেন—'ভদ্রমহোদয়গণ, একবার তাদের অবস্থিতি লক্ষ করুন। এটা যে শুধু শহরের মধ্যস্থল তা নয়, বরং এটা শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র; অতএব প্রতিটি সম্মানিত ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতেই হয়। উপরন্তু অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পুণ্যশীলা স্ত্রী-কন্যারা বিকিকিনির জন্য অহরহ এখানে আসতে বাধ্য হন। এসব নির্লজ্জ, অর্ধউলঙ্গ বেশ্যাদের সাজ-পোশাকের চাকচিক্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনেও নানারকম রঙিন-রঙিন আকাঙ্ক্ষা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, আর ঘরে ফিরে এসে তাঁদের দরিদ্র স্বামীদের ওপর বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্য, নিত্যনতুন শাড়ি ইত্যাকার অনেক জিনিসের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। ফলে সুখী-স্বচ্ছন্দ পরিবারগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। ভদ্রমহোদয়গণের অবগতির জন্য আমি আরো একটি জিনিসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের কচি ছেলেরা জাতির ভবিষ্যৎ। জাতি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। জাতিকে কালের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব এদেরই। এইসব ছেলেদের সকাল-সন্ধ্যা এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। এসব বেশ্যারা সবসময় রকমারি মনমাতানো সাজ পরে। লোভনীয় প্রসাধনীর আবরণে নিজেদের ঢেকে সবাইকে রূপচর্চায় আমন্ত্রণ জানায়। এসব দেখেশুনে আমাদের অপরিণামদর্শী, আত্মভোলা ছেলেরা যৌবনের উন্মাদনায় বিহ্বল হয়ে নিজেদের এর ভেতর জড়িয়ে ফেলে। এ-অবস্থায় তাদের পক্ষে নিজেদের সৎস্বভাবকে পাপের বিষাক্ত ছোবল থেকে সরিয়ে রাখা কি সম্ভব? অতএব মহোদয়গণ, এসব রূপোপজীবীরা কি এদের জাতি গঠনমূলক কাজ থেকে বিমুখ করে তাদের মনে পাপ-বাসনা সৃষ্টি করে তাদের একটা বিশ্রী ব্যাকুলতা, চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার শিকারে পরিণত করছে না?'

এই সুযোগে যোগ-বিয়োগে সিদ্ধহস্ত একজন প্রাক্তন শিক্ষক বললেন—'মহোদয়গণ, মনে রাখবেন—পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এবার দেড় গুণ বেড়ে গেছে।'

অতঃপর একজন চশমাধারী সদস্য উঠলেন। তিনি একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। বললেন—'আমাদের শহর থেকে দিন-দিন মর্যাদাবোধ, আভিজাত্য, পৌরুষ,

পুণ্যশীলতা আর সংযম যাচ্ছে উঠে। এর বদলে হীনমন্যতা, কাপুরুষতা, বদমায়েশি, চৌর্যবৃত্তি বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ দিন-দিন ধ্বংসের দুর্গম অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। হত্যা, লুণ্ঠন আর আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে মানুষের এই রূপ প্রকট হয়ে উঠছে। এর একমাত্র কারণ এসব অস্পৃশ্য নারীদের আত্মঘাতী প্রভাব। আত্মভোলা শহরবাসীরা এসব ছলনাময়ী নারীদের রূপের শিকার হয়ে সিদ্ধ-অসিদ্ধ যে কোনো উপায় টাকা সংগ্রহ করে এদের পেছনে ঢালছে। মাঝে-মাঝে এ ব্যাপারে তারা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, তারা মনুষ্যত্ববোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে বসে, ফলে হয় তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়, অথবা জেলখানার চার দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।'

একজন পেনশনপ্রাপ্ত সদস্য উঠলেন। তিনি একটি বিস্তৃত আর উন্নত বংশের পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবীর ভাব ও মিঠেকড়ার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। এখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অবশিষ্ট দিনগুলো একটু আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দিতে চান এবং বংশধরদের নিজের পক্ষপুটে উন্নত আর উদ্ধত দেখে যেতে চান। তিনি অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় বললেন—'জনাব, রাতের পর রাত এদের তবলার ডুগডুগি, গলাবাজি, এদের গ্রাহকদের হৈ-হল্লা, গালিগালাজ, শোরগোলের প্রচণ্ড শব্দ শুনতে-শুনতে আশেপাশের ভদ্রলোকদের কানে তালা লাগার উপক্রম হয়েছে। রাতের নিদ্রা, দিনের বিশ্রামকে পণ্ড করে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে এরা। উপরন্তু এদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে আমাদের বৌ-ঝিরা কীভাবে প্রভাবিত তা সকলেই অনুমান করতে পারেন...।' শেষের অংশটুকু বলতে তাঁর গলার শব্দ আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো শব্দই বের হল না। সকল সদস্যেরই তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি ছিল। কারণ দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রাচীন বাড়িটি এসব রূপোপজীবীদের এলাকার একেবারে নিকটে।

এরপর একজন রক্ষণশীল সদস্য দণ্ডায়মান হলেন। রক্ষণশীলতা তাঁর কাছে নিজের সন্তান-সন্ততির মতোই প্রিয়। তিনি বললেন—'বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ভ্রমণকারী আমাদের এই প্রসিদ্ধ শহর পরিদর্শনে আসেন। এসব দেখার পর তাঁদের মনে কী ধারণা জন্মে তা একবার ভেবে দেখুন।'

এবার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বক্তৃতা করতে উঠলেন। কাঠখোট্টা গোছের এই ভদ্রলোকটির ছোট-ছোট হাত-পা। কিন্তু তাঁর মাথাটা বেশ বড়-সড় বলে খানিকটা গম্ভীর দেখায়। তিনি বললেন—'বন্ধুগণ, এ-ব্যাপারে আংশিকভাবে আপনাদের সঙ্গে আমি একমত। সত্যিই এদের জন্যে আমাদের শহর, আমাদের সংস্কৃতি দারুণ সংকটের মুখোমুখি। কিন্তু মুশকিল বাধছে এর প্রতিকার নিয়ে। যদি এদের এই নীচ ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয় তা হলে প্রশ্ন উঠবে—এরা খাবে কী করে?'

একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন—'এরা বিয়ে করে না কেন?'

এ প্রশ্নে একটা তরল হাসির রোল উঠল। হলের থমথমে ভাব এতে বেশ খানিকটা লঘু হয়ে হলের প্রতিটি মানুষের মুখমণ্ডলে একটা সরস ভাব ফুটে উঠল।

অবস্থা খানিকটা শান্ত হলে সভাপতি সাহেব বললেন—'বন্ধুগণ এই প্রস্তাব ইতিপূর্বে অনেকবার এদের সামনে তোলা হয়েছে। তাদের তরফ থেকে জবাব এসেছে—কোনো অভিজাত বংশের গৃহে এরা বধূ হিসেবে প্রবেশাধিকার পাবে না। আর যেসব দরিদ্র, নীচ বংশের লোক অর্থের লোভে এদের বিয়ে করতে চাইবে তাদের এরা পাত্তা দেবে না।'

এ কথা শুনে জনৈক সদস্য বললেন—'এসব ব্যাপারে সদস্যদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তারা যেখানেই থাক-না কেন, আমাদের দায়িত্ব হল তাদের এই শহর থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।'

সভাপতি বললেন—'সেটিও অত সোজা কাজ নয়। এরা তো আর দশ-বিশ জন নয়, হাজারের ওপর এদের সংখ্যা। উপরন্তু এদের মধ্যে অনেকের নিজস্ব বাড়িঘরও রয়েছে।'

ব্যাপারটি বেশ কয়েকমাস যাবত মিউনিসিপ্যালিটির আয়ত্তাধীনে থাকল। শেষে সদস্যদের সম্মিলিত মতে সাব্যস্ত হল যে, এসব দেহপসারিণীদের জায়গা-সম্পত্তি খরিদ করে নেয়া হবে এবং শহর থেকে বেশ দূরে পুনর্বাসন করা হবে এদের। মিউনিসিপ্যালিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেশ্যাদের ভেতর প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। অনেকে এই আদেশ অমান্য করে জরিমানা এবং জেল পর্যন্ত ভোগ করল। তবুও মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে তাদের কোনো দাবি টিকল না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মেনে নিতেই হল এই সিদ্ধান্ত।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল এসব বাড়ির সীমানা নির্ধারণ আর গ্রাহক ঠিক করতে। বারবার এসব বাড়ি নিলামে উঠতে শুরু করল। বেশ্যাদের ছয়মাস পর্যন্ত তাদের পুরনো বাড়িতে থাকার অনুমতি দেয়া হল যাতে এই সময়ের মধ্যে ওরা নতুন স্থানে বাড়িঘর তুলবার সময় পায়।

শহর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে এদের জন্য স্থান নির্বাচন করা হল। পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত পাকা রাস্তা, বাকি ক্রোশখানেক পথ কাঁচা। কোনোকালে হয়তো-বা এখানে জনবসতি ছিল কিন্তু এখন তার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সাপ-বাদুড়ের দল এখানে বাসা বেঁধেছে। এই এলাকার কাছেই একটি গ্রাম। কাঁচা ছোট-ছোট বাড়িঘর। তা-ও এখান থেকে দু-আড়াই মাইলের কম হবে না। এ গাঁয়ে যারা থাকে তারা সকলেই প্রায় কৃষক। ওরাই দিনের বেলায় ক্ষেত-খামারের কাজে বা এমনি ঘুরতে-ফিরতে এদিকে আসে। অন্যথায় সমগ্র জায়গাটাই গভীর নির্জনতার ভেতর ডুবে থাকে। এমনকি দিনে-দুপুরেও এখানে শৃগালের উপদ্রব দেখা যায়।

বেশ্যাদের মধ্যে চৌদ্দজন বেশ অবস্থা-সম্পন্ন। তাদের পক্ষে যে কোনো কারণে—সে নিজেদের প্রেমিকদের মনোরঞ্জনে অপারগ হয়ে হোক বা নিজেদেরই আত্মতুষ্টির তাগিদে হোক—শহরের আশেপাশে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ল। অন্যান্যরা মনে করেছিল তারা শহরের বিভিন্ন হোটেলেই নিজেদের আস্তানা গেড়ে বসবে অথবা বাইরে ভদ্রবেশ ধারণ করে ভেতরে ভেতরে শহরের অভিজাত অঞ্চলে থেকে যাবে, অথবা অন্য কোনো শহরে চলে যাবে।

এই চৌদ্দজন বেশ্যা সত্যি-সত্যি অবস্থা-সম্পন্ন। তার ওপর শহরের বাড়িঘরের দাম তারা উশুল করেই ফেলেছে, নতুন স্থানে জলের দরে জায়গাও পেয়েছে। উপরন্তু তাদের প্রেমিকরাও মনে-প্রাণেই তাদের আর্থিক সাহায্য করতে প্রস্তুত। অতএব এখানে তারা মনোমতো অট্টালিকা তৈরি করতে মনস্থ করল। ভাঙাচোরা কতকগুলো কবর থেকে দূরে সমতল একখানা উঁচু স্থান ঠিক করল তারা। জায়গা পরিষ্কার করে নকশা-তৈরি করা হল। দিনকতক পরই শুরু হয়ে গেল নির্মাণের কাজ।

প্রত্যেকদিন ইট, মাটি, কড়িকাঠ ইত্যাদি ট্রাক, ঠেলাগাড়ি, খচ্চর, গাধা, মানুষ ইত্যাদির উপর বোঝাই হয়ে আসতে লাগল এখানে। মুন্সি তার খাতাপত্র নিয়ে এসব জিনিস গুণে-পড়ে খাতায় লিখতে লাগল। কন্ট্রাক্টর মাঝিদের আর মাঝিরা কুলিদের ফরমাস দিতে লাগল বিভিন্ন কাজে। বিভিন্ন কাজে কুলিরা মাঝিদের চড়া গলার নির্দেশ মতো কাজ করার জন্য চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। মোটের ওপর সমগ্র এলাকায় নতুন প্রাণস্পন্দন জাগল। গাঁয়ের কিষাণ আর বধূরা লোহালক্কর, ইট-পাটকেলের নতুন শব্দ শুনতে পেল।

এই ধ্বংসাবশেষের ভেতর একটা ভাঙা-চোরা মসজিদের চিহ্নও ছিল। তার পাশেই একটা কুয়ো—যা আজ অকেজো পড়ে আছে। রাজমিস্ত্রিরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে বা নামাজিদের সুবিধার জন্য প্রথমেই পরিষ্কার করল কুয়োটা। এটির প্রয়োজন ছিল আর পুণ্যের কাজ বলেও এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। দু-তিন দিনের ভেতর তৈরিও হয়ে গেল মসজিদ।

প্রত্যেকদিন বেলা বারটার সময় দুশ-আড়াইশ রাজমিস্ত্রি, কুলি, কন্ট্রাক্টর, মুন্সি আর বেশ্যাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে জড়ো হতে লাগল। এই সময় স্থানটি সরগরম থাকত বেশ কিছুক্ষণের জন্য।

একদিন পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামের একজন বৃদ্ধা কৃষাণী এই বস্তির খবর পেয়ে বেড়াতে এল এখানে। তার সঙ্গে ছোট একটা ছেলে। এরা মসজিদের পার্শ্বে পান-বিড়ি ও ঘরে তৈরি বিভিন্ন রকম মিষ্টি বিক্রি শুরু করে দিল। বৃদ্ধাটির আগমনের পর দিনকতক যেতে-না-যেতেই এক বৃদ্ধ কিষাণ মাটির মটকা নিয়ে হাজির হল জায়গাটায়। আর কুয়ার পাশে ইটের চত্বর তৈরি করে পয়সায় দু'গ্লাস করে শরবত বিক্রি করতে শুরু করে দিল। একজন তরকারি-বিক্রেতা এই খবর পেয়ে একঝুড়ি ফলমূল নিয়ে বসে গেল বৃদ্ধার পাশে আর বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিমায় চিৎকার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। একজন বাড়ি থেকে বিভিন্ন রকম খাবারের জিনিস রান্না করে এনে মজুরদের ভেতর থালাবাটিতে করে পরিবেশন করতে লাগল।

জোহর এবং আসরের সময় কন্ট্রাক্টর আর মাঝিদের কুলিদের সাহায্যে কুয়া থেকে পানি তুলে ওজু করতে দেখা যেতে লাগল। মসজিদে গিয়ে আজান দিত একজন। অতএব ইমাম তৈরি করা হল একজনকে। অন্যান্য সবাই তার পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়মিত নামাজ পড়তে লাগল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মোল্লার কানে এই খবর গিয়ে পৌছল। খবর পেয়েই তিনি কোরআন শরীফ, পাঞ্জসুরা ইত্যাদি সহ আরো কিছু ছোটখাট কিতাবপত্র নিয়ে এখানে এসে হাজির হলেন। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ওপর ইমামতির দায়িত্বভার অর্পণ করা হল।

প্রতিদিন তৃতীয় প্রহর নাগাদ একজন কাবাবি মাথায় একটা টুকরি নিয়ে হাজির হত এখানে। সে প্রথম বৃদ্ধার পাশে মাটিতে একটি উনুন তৈরি করল; তারপর শিকে ভেজে কাবাব, কলিজা ইত্যাদি বিক্রি করতে লাগল মজুরদের ভেতর। এক কিষাণী এসব কাণ্ড দেখে-শুনে তার স্বামীকে নিয়ে হাজির হল এখানে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে মসজিদের পাশে একখানা ছোট্ট কুটির তৈরি করে গরম করতে লেগে গেল উনুন। কখনো-কখনো গ্রাম্য ক্ষৌরকারকে তার সাজ-সরঞ্জাম সমেত আনাগোনা করতে দেখা গেল।

বেশ্যাদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরাই সাধারণত নির্মাণকার্য দেখাশোনা করত। কোনো-কোনোদিন দ্বিপ্রহরের দিকে নিজ-নিজ কাজ সেরে তারাও নিজ-নিজ প্রেমিকদের সাথে নিয়ে এখানে আসত আর চলে যেত সূর্যাস্তের আগে। এই সময় বেশ কিছু দরিদ্র লোক এসে জুটত। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত-না কিছু পেত ততক্ষণ এমন নাকি কান্না চালিয়ে যেত যে, সবার পক্ষে সাধারণ আলাপ-আলোচনা করা দুরূহ হয়ে পড়ত। শহরের কিছুসংখ্যক লম্পট বসে থাকার চাইতে কিছু অকাজ করাও ভালো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এখানে এসে ভিড় জমাতে লাগল। তাদের আগমনের দিন বেশ্যারা এসে পড়লে তো আর কথাই নেই। তারা বেশ্যাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে টহল দিতে থাকত। সেদিন বেশ জমে উঠত কাবাবের দোকান।

এ সব দেখে-শুনে—কিছুসংখ্যক ভণ্ড সাধু—বেশ্যাদের কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে মিতালি জমিয়ে তুলতে লাগল।

এই বস্তির পাশেই ছিল একখানা ভাঙাচোরা মাজার। দেখলে মনে হবে, হয়তো কোনো সিদ্ধপুরুষের মাজার। সে-মাজারেরও একদিন সংস্কার শুরু হয়ে গেল। মাজার সংস্কারের কাজ যখন অর্ধেকের চাইতেও বেশি এগিয়ে গেল তখন এক প্রভাতে মজুরেরা দেখল মাজারের পাশ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ব্যাপার কী? সবাই দেখল লাল-লাল একজোড়া চোখ নিয়ে একজন লম্বাচওড়া অর্ধপাগল আর অর্ধউলঙ্গ মানুষ মাজারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে আর ছোট-ছোট অঙ্গার নিক্ষেপ করছে এদিক-সেদিক। দ্বিপ্রহর নাগাদ সে লোকটা কলসি নিয়ে কুয়ার পাড়ে এল। জল তুলে মাজার ধোয়ার কাজে লেগে গেল। একবার সে কুয়ার পাড়ে কিছু মজুরের সাক্ষাৎ পেল। তাদেরকে দেখে আধ-পাগলের মতো লোকটা নির্লিপ্তভাবে বলল—'জান, এটা কার মাজার? ফড়ক শাহ পীর বাদশার মাজার এটা। আমার বাপ-দাদা তাঁর খাদেম ছিলেন।' এরপর সে হাসতে-হাসতে চোখের জল ফেলল কিছুক্ষণ আর ফড়ক শাহের কিছু কেরামতি মজুরদের কাছে বর্ণনা করল।

সন্ধ্যায় সে খুঁজে-মেগে জোগাড় করল মাটির একটি বাতি। তেল ভরে সেটি মাজারে জ্বেলে দিল। এর পর থেকে শেষরাতের দিকে মাঝে-মাঝে মাজার থেকে 'আল্লাহু' শব্দ বাতাসে-বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছ মাস যেতে-না-যেতেই চৌদ্দটি বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। সবগুলো বাড়ি পাশাপাশি, দ্বিতল এবং একই ধরনের। একদিকে সাতটি অপর দিকে সাতটি। মাঝখানে চওড়া রাস্তা। প্রতিটি বাড়ির নিচের তলায় চারখানা করে দোকানঘর। ওপরের তলার সামনের দিক বাইরের দিকে উন্মুক্ত। জায়গাটাকে বিভিন্ন রকম দামি পাথরের কারুকার্য করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হল। এর পেছনেই বেশ বড় ড্রইংরুম। চারদিকে সুন্দর কারুকার্যে পরিপূর্ণ। সুন্দর লাল রঙের চকচকে পাথরের মেঝে। মোটের ওপর অত্যন্ত পরিপাটিভাবে সম্পূর্ণ বাড়িগুলো সজ্জিত।

বুধবার এই গ্রামে স্থায়ীভাবে পদার্পণের দিন ধার্য করা হল। সেদিন বেশ্যারা মিলে বেশ ধুমধামের সঙ্গে উৎসব করল। খোলা মাঠে জমি পরিষ্কার করে টাঙানো হল সামিয়ানা। ডেকচির ঘড়-ঘড় শব্দ, মাংস আর ঘৃতের সুঘ্রাণ পার্শ্ববর্তী সুদূর এলাকা থেকে ভিক্ষুক আর কুকুরদের আকর্ষণ করে নিয়ে এল। পীর ফড়ক শাহের মাজারের পাশেই খাদ্য বিতরণ করা হল। অনেক ভিক্ষুক জমা হয়ে গেল দুপুর নাগাদ। পীর ফড়ক শাহের মাজারকে

চমৎকারভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হল, তার ওপর জড়িয়ে দেয়া হল ফুলের চাদর। অর্ধ-পাগল লোকটিকে নতুন কাপড় তৈরি করে দেয়া হলে সে পরেই তা ছিঁড়ে ফেলল।

সন্ধ্যায় সামিয়ানা টাঙিয়ে উজ্জ্বল আলোয় স্থানটিকে আলোকিত করা হল। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে বস্তিটির উদ্বোধন পর্ব সমাপন করা হল। দূর-দূরান্তর থেকে অন্যান্য বেশ্যাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এরা স্থানীয়দের আত্মীয়-স্বজন। এদের বন্ধু-বান্ধবেরাও এল এদের সঙ্গে। তাদের জন্য আলাদাভাবে বসার বন্দোবস্ত করা হল। অসংখ্য গ্যাসবাতির আলোয় ঝলমল করে উঠল স্থানটি।

উৎসব চলল দু'তিন দিন যাবৎ। এবার বেশ্যারা বাড়িঘর সাজানোর কাজে মনোনিবেশ করল। ঝাড়লণ্ঠন, ড্রেসিং টেবিল, সুদৃশ্য পালঙ্ক এবং বিভিন্ন প্রকার চিত্র লাগিয়ে ভেতর-বাহির সজ্জিত করতে প্রায় আট দিন লেগে গেল।

এসব মেয়েরা দিনের বেশিরভাগ সময়ে শিক্ষকদের কাছে গান, বাজনা, গজল পাঠ, লেখাপড়া ইত্যাদি শিখত। অন্য সময়ে গ্রামোফোন, তাস, কেরাম ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকত। এরপর প্রত্যহ স্নানাগারে গিয়ে চাকর দিয়ে তোলা জলে গোসল সেরে সাজসজ্জায় মেতে উঠত। এটি তাদের প্রাত্যহিক নিয়মে পরিণত হল।

রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্যাসের আলো জ্বল-জ্বল করে উঠত। বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথরের গায়ে লেগে চকচক করে উঠত আলো। দরজা জানালার গায়ে বিভিন্ন রকম কারুকার্যখচিত কাচে আলো চকচক করলে অনেক দূর থেকেও মনোরম দেখা যেত। এরপর সাজসজ্জা করে লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে খোশ-গল্পে মেতে উঠত বেশ্যারা। গলাগলি-ঢলাঢলি করে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধবধবে ফরাসের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ত ওরা। রাত বেড়ে গেলে এদের সঙ্গে মিলনপ্রত্যাশীরা টুকরির ভেতর মদের বোতল আর ফল-মূল নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মোটর বা টাঙায় চড়ে এসে জড় হত। তাদের পা পড়তেই বস্তিতে একটা আলাদা প্রাণস্পন্দন শুরু হত। গান-বাজনার তালে-তালে নৃত্যের ঝংকারে একটা অদ্ভুত প্রাণমাতানো পরিবেশ সৃষ্টি হত। হৈ-হাঙ্গামার ভেতর কখন যে রাত কেটে যেত টেরও পেত না কেউ।

বেশ্যাদের আগমনের দিনকয়েকের মধ্যেই দোকানের ভাড়াটে জুটে গেল। বস্তি চালু করার জন্য এ-সব দোকানের ভাড়াও কম করে ধরা হয়ছিল। সেই বুড়িটিই প্রথম দোকানের ভাড়া নিল যে সবার আগে মসজিদের সামনে গাছের তলায় টুকরি নিয়ে বসেছিল। দোকান জাঁকালো দেখাবার জন্য তার ছেলে সিগারেটের খালি প্যাকেট এনে তাকের উপর সাজিয়ে রাখল। বোতলের ভেতরের রঙিন জল ভরে রাখতে লাগল সে যাতে দেখলেই শরবত মনে হয়। বুড়ি নিজ খেয়ালমতো কাগজের ফুল আর সিগারেটের খালি প্যাকেটের সাহায্যে বিভিন্ন রকম সুদৃশ্য জিনিস তৈরি করে দোকান সাজাল। বিভিন্ন নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি পুরাতন সিনেমা-মাসিক থেকে ছিঁড়ে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হল। দোকানের আসল মালের ভেতর মাত্র দু-তিন রকম সিগারেটের খান-তিনেক করে প্যাকেট আর আট-দশ বান্ডিল বিড়ি। কয়েক ডজন দিয়াশলাই, পানের একটা পাত্র, সামান্য তামাক আর কয়েক বান্ডিল মোমবাতি।

দ্বিতীয় দোকানে একজন শস্য ব্যবসায়ী, তৃতীয় দোকানে খাদ্য-বিক্রেতা, চতুর্থ দোকানে কসাই, পঞ্চম দোকানে কাবাব প্রস্তুতকারী ও ষষ্ঠ দোকানে একজন তরিতরকারি বিক্রেতা

বসে গেল। আশেপাশের গ্রাম থেকে কম মূল্যে কয়েক রকমের তরিতরকারি এনে এখানে বেশ লাভে বিক্রি করত তরিতরকারিওয়ালা। সে এক-আধ টুকরি ফুলও রাখত, যাতে দোকানের সৌন্দর্য বাড়ে। একজন ফুলওয়ালা তার অংশীদার হল। সে দিনভর ফুলের মালা তৈরি করে একটা আংটায় বেঁধে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। লোকটা শুধু ফুলই বিক্রি করত না, মাঝে-মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে তামাকও টানত। তার সামনে যদি কোনো পুরুষ বেশ্যাদের খোঁজে আসত তবে আড্ডা জমে উঠত আরো। তখন সে আর উঠবার নামও নিত না। কখনো রাত বেশি হয়ে গেলে আর ফুলের মালা বিক্রি করতে না-পারলে সেগুলো নিজের গলায় পরে ঘরে ফিরে আসত।

একটা দোকানে একজন বেশ্যার বাপ আর ভাই এসে জুটল। সেলাইয়ের কাজ জানত ওরা। মেশিন সংগ্রহ করে ওরা বেশ জাঁকিয়ে বসল। এভাবে একজন ক্ষৌরকারও এসে জুটল। তার সঙ্গে এল একজন রঙ করার লোকও। লোকটি বিভিন্ন রকম রঙে দোকানের সম্মুখভাগকে রঙিন করে রাখল।

দিনকতক পর একজন মনোহারি দোকানদার এখানে এল। শহরে তার একটা দোকান ছিল। কিন্তু ব্যবসা মন্দার কারণে লোকটি এখানে দোকান খুলে বসল। বিভিন্ন রকম পাউডার, সাবান, চিরুনি, বোতাম, সুঁই-সুতা, লেস, ফিতা, সুগন্ধি তেল, রুমাল ইত্যাদি বিক্রি করতে লাগল সে।

এই বস্তির বাসিন্দাদের উৎসাহের ফলে অনেকগুলো ছোটখাট দোকানদার নিয়ত এখানে এসে ভিড়তে লাগল। এদের ব্যবসা মন্দার দিকে ছিল, কেননা শহরের ক্রমবর্ধমান ভাড়া দিতে অক্ষম ছিল তারা। এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল তারা।

একজন হেকিম সাহেব—যে হেকিমি শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু খবরাখবর রাখত—এসে এখানে হাজির হল। শহরের কোলাহল পছন্দ করত না বলে নিজের শিষ্যদের নিয়ে লোকটি এখানে একখানা ঘর ভাড়া করে জেঁকে বসল। সারাদিন ধরে হেকিম সাহেব আর তার শিষ্যরা ওষুধের শিশি, শরবতের বোতল, মোরব্বা, চাটনি আর আচারের বয়াম সাজিয়ে রাখল সুন্দরভাবে। একটি তাকে হেকিমি শাস্ত্রের ওপর বিভিন্নরকম ভালো-ভালো বইও সাজিয়ে রাখা হল। আলমারিতে বিভিন্ন রঙ-বেরঙের জেলি আর কাগজপত্র ঠেসে দেয়া হল। প্রত্যেক দিন সকালে বেশ্যাদের চাকর-বাকরেরা এসে বিভিন্ন রকম শরবত আর ওষুধপত্র কিনে নিয়ে যেত। এভাবে তার ব্যবসারও বেশ পসার জমে উঠল।

যে-সব দোকানের ভাড়াটে পাওয়া গেল না, ওসব দোকানে বেশ্যাদের ভাই-বন্ধুরা চারপায়া বসিয়ে সারাদিন তাস-সতরঞ্জ পিটতে লাগল। মাঝে-মাঝে তারা শাকসবজি কুটতে-কুটতে হৈ-হুল্লাও করতে থাকল সেখানে।

বেশ্যাদের অনুগ্রহীতাদের একজন একটি দোকান খালি দেখে তার ভাইকে এনে বসাল। সে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে জানত। দোকানের দেয়ালের সঙ্গে পেরেক লাগিয়ে ভাঙাচোরা সারেঙ্গী, সেতার, তানপুরা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানোতেও ওস্তাদ ছিল লোকটি। সন্ধ্যার পর-পরই সে সেতার বাজাত। সেতারের মিষ্টি সুরে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের দোকান থেকে লোকজন এসে জমায়েত হয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ তার বাজনা শুনত। এই লোকটির শিষ্য ছিল একজন। সে রেলওয়েতে কেরানির চাকরি করত। সেতার শেখার দিকে তার বেশ ঝোঁক। অফিস ছুটি হলেই সে সাইকেলে

চড়ে সোজা এই বস্তিতে চলে আসত। মোট কথা এই বাদকের প্রাণপ্রাচুর্যে সর্বদাই বস্তিটি সরগরম থাকত।

বস্তির নির্মাণকার্য চলাকালে মসজিদের মোল্লাজি রাত্রে গ্রামে চলে যেতেন কিন্তু এখন চারদিকে নিমন্ত্রণ বেড়ে যাওয়ায় তিনিও এখানেই থাকতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে বিভিন্ন বেশ্যাদের ঘর থেকে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করলে তাঁর আমদানিও বেশ বেড়ে গেল।

একটি ছোটখাট ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার কোম্পানিও এখানে এসে জুটল এক সময়। শহরের ক্রমবর্ধমান ভাড়া আর অত্যল্প চাহিদার দরুন ওরা এখানে আসতে বাধ্য হল। বেশ্যাদের ঘর থেকে খানিকটা দূরে তাঁবু ফেলল এরা। এই কোম্পানির অভিনেতাদের শিল্প সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। পোশাক-পরিচ্ছদও ছেঁড়া। জোড়াতালি লাগানো। এরা খেলাধুলা যা দেখাত তা-ও মান্ধাতার আমলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কোম্পানি বেশ চালু হয়ে গেল। কারণ থিয়েটারের প্রবেশমূল্য ধরা হয়েছিল অত্যন্ত কম। শহরের দিন-মজুর, কারখানার শ্রমিক, আর দরিদ্র জনসাধারণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখানে এসে খানিকটা তৃপ্তি পেত। দূর-দূরান্তর থেকেও লোক এসে এ-সব দেখত, আর দেখত মনমাতানো নারীসৌন্দর্য যা মানুষকে অহরহ প্রলুব্ধ করে। থিয়েটার শুরু না-হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির ভাঁড় বাইরে এসে বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি করে খুশিতে মশগুল রাখত দর্শকদের।

এমনি করে ধীরে-ধীরে অনেকে এই বস্তিতে আসতে লাগল। অতএব শহরের বিভিন্ন স্থানে টাঙ্গার গাড়োয়ানরা হাঁকতে লাগল—'নতুন শহর কে যাবে এস।' শহর থেকে পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত পাকা রাস্তা। গাড়োয়ানের বকশিসের লোভে এই রাস্তার মাথা পর্যন্ত এসে যেত। সওয়ারির নির্দেশে তারা বেশ জোরে-সোরে ঘোড়া হাঁকাত, সঙ্গে-সঙ্গে মুখে বিভিন্ন রকম শব্দ করত। এদের ভেতর চলতে থাকত প্রতিযোগিতা। যদি কোনো গাড়ি অন্য একখানাকে ফেলে আগে চলে যেত তা হলে আগের গাড়ির সওয়ারিরা মাথা উঁচিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠত। এই প্রতিযোগিতায় কাহিল হয়ে পড়ত নিরীহ ঘোড়াগুলো। ঘোড়ার গলার মালা থেকে সুগন্ধের বদলে ঘাসের দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসত।

রিকশাওয়ালারাও টাঙ্গার পেছনে পড়ে রইল না। তারাও কম দামের সওয়ারি নিয়ে ঘুঙুরের শব্দে চারদিক মুখরিত করে এগিয়ে চলত। এ ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সাইকেলে চড়ে আসত এই রহস্যপূর্ণ বাজার পরিদর্শনে। তাদের ধারণা—অভিভাবকেরা অনর্থক এই বাজার দেখার সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করছে।

দেখতে-দেখতে এই বস্তির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে দোকান আর বাড়ির দামও বেড়ে গেল। যে-সব বেশ্যারা এখানে আসতে চায়নি তারাও এই বস্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে মনে-মনে নিজেদের বোকামির কথা চিন্তা করে অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগল। কেউ-কেউ তাড়াতাড়ি জায়গাজমি কিনে বাড়িঘর তৈরি শুরু করে দিল। এ ছাড়াও শহরের কিছুসংখ্যক মহাজন বস্তির আশেপাশে জায়গা কিনে ঘর তুলে ফেলল ছোট-ছোট। ফল দাঁড়াল এই যে, যে-সব প্রগলভ মেয়েছেলেরা হোটেলে আর অভিজাত মহল্লায় মুখ ঢেকে ছিল তারাও সুযোগ পেয়ে পঙ্গপালের মতো বেরিয়ে এসে এ-সব বাড়িঘরে নিজেদের আড্ডা গেড়ে বসল। কিছু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনসম্পন্ন মানুষও এখানে এসে ভাড়া করল দোকান। তারা রাত্রে দোকানে থাকত না।

এই বস্তির আজাদি তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু এখনো বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হল না। অতএব বেশ্যা এবং এই এলাকার বাসিন্দাদের তরফ থেকে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য আবেদন করে সরকারের নিকট আরজি পেশ করা হল। দিনকয়েক পরেই মঞ্জুর হয়ে গেল তাদের আবেদন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ডাকঘরও খোলা হল। একজন মুন্সি মিয়া ডাকখানার বাইরে একটা সিন্দুক পুঁজি করে দোয়াত-কলম নিয়ে লিখে দিতে লাগল মানুষের চিঠিপত্র।

একবার মদখোরদের আড্ডায় এক জঘন্য ঝগড়া বেঁধে গেল। ঝগড়ায় সোডার বোতল ছোঁড়াছুড়ি আর ইটের যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করা হল। গুরুতররূপে আহত হল অনেকে। এতে সরকার বুঝল পুলিশ-স্টেশন খোলা অপরিহার্য এই বস্তিতে।

থিয়েটার কোম্পানি দু'মাস থেকে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে চলে গেল। শহরের একটি সিনেমার মালিক এই অবস্থা দেখে ভাবল—এখানে একখানা সিনেমা হল খুললে কেমন হয়? যেই ভাবনা অমনি কাজ। সে তাড়াতাড়ি একখানা ভালো জায়গা খুঁজে সিনেমা হল নির্মাণের কাজ শুরু করে দিল। কয়েক মাসের ভেতর সিনেমা হলের কাজ শেষ হয়ে গেল। হল এলাকার ভেতর তৈরি করা হল ছোট্ট একখানা বাগান—যাতে ছবি শুরু হবার আগে এসে পড়লে দর্শকেরা এখানে বিশ্রাম নিতে পারে। বস্তির লোকেরাও এখানে এসে নিত্য আড্ডা জমাতে লাগল। ফলে এটি পরিণত হল একটি প্রমোদ-উদ্যানে। মাঝে-মাঝে এক তেল মালিশওয়ালা ওয়াচ কোটের পকেটে বিভিন্ন রকম সুগন্ধিযুক্ত তেলের শিশি নিয়ে হাঁক ছাড়তে-ছাড়তে মাথাব্যথাওয়ালাদের কাছে নিজের জারিজুরি দেখাতে লাগল।

দোকানগুলোর একটায় একজন লোক সোডাওয়াটারের ফ্যাক্টরি খুলল। এ ছাড়াও একজন লন্ড্রিওয়ালা, এক ফটোগ্রাফার, একজন সাইকেল মেরামতকারী, একজন বুটপালিশওয়ালা ও একজন ডাক্তার ওষুধের দোকান সমেত এসে ভিড়ল। দেখতে-দেখতে একজন সরাইখানার মালিক মদের দোকান খোলার অনুমতি পেয়ে গেল। ফটোগ্রাফারের দোকানের বাইরে এককোণে একজন ঘড়ি মেরামতকারীও এসে খুলে বসল তার ব্যবসা আর প্রত্যহ একটা ছোট আয়না চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল ঘড়ি।

এর কিছুদিন পর বস্তির আলো, জল ইত্যাদির সুবন্দোবস্তের দিকে দৃষ্টি দেয়া হল। সরকারি কর্মচারীরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে রাস্তাঘাট মেরামত করার জন্য বড় বড় ইঞ্জিন চালিয়ে দিল সশব্দে।...

এভাবে কেটে গেল বিশটি বছর। বস্তি এখন ভরপুর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে টাউন হল, কোর্ট, জেলখানা সবই স্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রায় আড়াই লক্ষ লোক এখন এই শহরের অধিবাসী। শহরে একটা কলেজ, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক দুটো হাইস্কুল, আটটা অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল গড়ে উঠেছে। এছাড়াও খোলা হয়েছে ছ'টা সিনেমা হল, চারটা ব্যাঙ্ক। এসবের মধ্যে পৃথিবীর বড়-বড় দুখানা ব্যাঙ্কের শাখাও রয়েছে।

এই শহর থেকে দু'খানা দৈনিক, তিনখানা সাপ্তাহিক আর দশখানি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত বের হচ্ছে। তার ভেতর চারখানা সাহিত্য সম্পর্কীয়, দু'খানা কৃষি সম্পর্কীয়, একখানা ডাক্তারি, একখানা মহিলা বিষয়ক ও একখানা ছোটদের পত্রিকা রয়েছে। শহরের

বিভিন্ন স্থানে বিশটা মসজিদ, পনেরটা মন্দির ও ধর্মশালা, ছয়টি এতিমখানা, পাঁচটি অনাথ আশ্রম আর তিনটি বড়-বড় সরকারি হাসপাতাল খোলা হল। একটা হাসপাতাল শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট।

প্রথম কয়েক বছর শহরটি এর বাসিন্দাদের ইচ্ছামতো 'হুসনাবাদ' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু অনেকে এটাকে একটু রদবদল করে 'হাসনাবাদ' রাখল। শেষে এটাও টিকল না। কারণ জনসাধারণ 'হাসান' আর 'হুসন'-এর ভেতর কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে অপারগ। অতএব অনেক বড়-বড় বই-পুস্তক, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে এই বস্তির আসল নাম বের করা হল। হাজার-হাজার বছর আগের নামানুসারে এই শহরের নাম রাখা হল 'আনন্দী নগরী।'

এমনিতে সমগ্র শহরটাই ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। কিন্তু সবচাইতে সুন্দর আর ব্যবসার আসল কেন্দ্রস্থল হচ্ছে—শহরের বেশ্যারা যেখানে থাকে সেই জায়গাটা।

'আনন্দী নগরীর' মিউনিসিপ্যালিটির সভা বেশ জমেছে। হল লোকে পরিপূর্ণ। অন্যান্য দিনের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতিটি সদস্যই আজ উপস্থিত রয়েছেন। আলোচনার বিষয় হল—শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বেশ্যাদের শহর থেকে অপসারণ করা। কারণ এরা মানবতা, সংস্কৃতি আর আভিজাত্যের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কলঙ্কের মতো বিরাজ করছে।

একজন সুবক্তা বললেন—'জানি না আমাদের পূর্বপুরুষেরা এমন কী দেখেছিলেন, যাতে করে এসব সমাজের কলঙ্কদের শহরের একেবারে মধ্যস্থলে স্থান করে দিয়েছিলেন?'

এবার এদের জন্য যে স্থানটি নির্ধারণ করা হল তা শহর থেকে বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

চড়ুইপাখি

খাজা আহমদ আব্বাস

লোকটির নাম রহিম। রহিম খান। নামের বিপরীত তার কাজ। নিষ্ঠুরতায় তার জুড়ি নেই এ অঞ্চলে। তার ভয়ে গ্রামটাও যেন কাঁপে। মানুষ বা পশু—কারো প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ নেই তার। একদিন কর্মকারের ছেলেটা রহিম খানের বলদের লেজে কয়েকটা কাঁটাগাছ বেঁধে দিয়েছিল। ছেলেটাকে কী মার! মারের চোটে যখন রক্তারক্তি অবস্থা, রহিম তখন ছেড়ে দিয়েছিল ছোঁড়াটাকে। গাঁসুদ্ধ বলাবলি করে, 'খোদার একটু ভয়ডর নেই দজ্জালটার। কচি বাচ্চাদের মারে যে, মূক পশুগুলোকে যে পিটুনি দেয়, এমন পাতকের কপালে নির্ঘাত দোজখ-বাস আছে।'

যত বলাবলি সবকিছু রহিম খানের পেছনে—অগোচরে। তারা সামনে কেউ খুলুক তো মুখ! বেচারা বুন্দু একদিন শুধু বলেছিল, 'আহা, বাচ্চাদের এমন করে মারতে নেই আব্বা।' আর যাবে কোথায়! রহিম ঝাঁপিয়ে পড়ে বুন্দুর ওপর। এমন মার খেল বুন্দু যে, পাড়ার প্রতিটি লোকে চমকে উঠল। পাছে রহিম বিরক্ত হয় তাই বুন্দুর কাছে কেউ সান্ত্বনা দিতেও ঘেঁষল না। গাঁ-সুদ্ধ সবাই বলাবলি করল 'ও বেটার মাথা খারাপ হয়েছে; ওকে পাগলা গারদে পাঠাও।' কিন্তু এ-সব কথাবার্তাও রহিম খানের পেছনে, নিভৃতে—সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

গ্রামের কেউ রহিম খানের সঙ্গে কথা বলে না। না-বলুক, রহিমের তাতে বিন্দুমাত্র আসে যায় না। কাঁধের উপর লাঙল নিয়ে সকালে সে মাঠে যায়। পথে কারো দেখা পেলে রহিম না-দেয় সালাম, না-করে কুশল জিজ্ঞাসা। দুটো বলদ তার। রহিম ওদের নাথু আর ছিদু বলে ডাকে। মাঠে পৌঁছে সে বলদদুটোর সঙ্গে কথা শুরু করে হাল দিতে-দিতে। হয়তো এক সময় চিৎকার করে ওঠে—

'এই শালা নাথু, সোজা লাইন ধর, ধর বলছি। তোর বাপ এসে চাষ দিয়ে যাবে রে হারামজাদা? এই ছিদু। তোর আবার কী হল রে হারামি?'

হাতের পাচনটা দিয়ে তারপর রহিম দমাদম ছিদু-নাথুকে পেটাতে থাকে। প্রহারে-প্রহারে বলদদুটোর সারা পিঠে শুধু ক্ষতের চিহ্ন।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বউ আর ছেলেদুটোকে নিয়ে রহিম খিস্তি শুরু করে। শাক-সবজি বা ভাজাভুজিতে বউ লবণ দিতে ভুলে গেছে তো আর রক্ষা নেই। কোনো ছেলে কোনো অপকর্ম করল তো রহিম তাকে পা উপরে বেঁধে গরুপেটা লাঠিটা দিয়ে পেটাতে থাকবে। বেহুঁশ না-হওয়া পর্যন্ত ছেলের নিস্তার নেই। প্রতিদিন এমনি একটা-না-একটা কিছু ঘটবেই ওই বাড়িতে। প্রায় প্রতি রাত্রে বউ-বাচ্চাদের ওপর গাল-খিস্তি মার-ধোর, ...যন্ত্রণায় ওরা

চিৎকার করতে থাকে। পাড়া-পড়শিরা দেখে-শুনেও কেউ আসে না। এগিয়ে এসে যে রহিমকে থামাবে, সে সাহস হয়ে ওঠে না কারো।

দিন-রাত মার খেয়ে বেচারি বউটা আধমরা হয়ে গেছে। বয়স ওর চল্লিশের কাছাকাছি হলেও বেচারিকে ষাট বছরের বুড়ির মতো লাগে। বাচ্চারা যতদিন ছোট ছিল, আচ্ছা মার খেয়েছে বাপের হাতে। বড় ছেলেটা যখন বাপের কোঠায়, একদিন কী কারণে বাপের হাতে একচোট বিষম মার খেল। মার খেয়ে সেই যে বাড়ি থেকে পালাল সেদিন, আর ফেরেনি।

কিছু দূরের এক গ্রামে ছেলেটার এক মামা থাকত। মামাই আশ্রয় দিল তাকে। বউ একদিন অনেক সাহস করে রহিমকে বলছিল, 'হিলামপুর যদি কখনো যাও, পায়ে পড়ি, নুরুকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' যেই-না বলা, শয়তান যেন তড়াক করে রহিমের ওপর ভর করল, 'কী বললি, হারামজাদাকে আমি ফিরিয়ে আনতে যাব।' রাগে কাঁপতে থাকে রহিম খান—'শুনে রাখ, ও ব্যাটা কখনও ফিরে এলে আর আস্ত রাখব না।'

সে যাই হোক, এমন মৃত্যুর খামারে নুরু আর কখনো ফিরে আসেনি; আসার দরকারও বোধ করেনি। দু'বছর পর ছোট ছেলেটাও পালাল। ভাইয়ের কাছে গেল পালিয়ে। রহিমের প্রতিমুহূর্তের যন্ত্রণা সহ্য করতে এখন থাকল শুধু বউ। কিন্তু সে-ও একদিন এমন মার খেল যে, বাড়ি ছাড়া ভিন্ন আর কোনো গত্যন্তর রইল না। কতদিনের সংসারের মায়া—সে মায়াও ছিন্ন করতে বেচারি বাধ্য হল। রহিম মাঠে চাষ করতে গেছে, এই সুযোগে ভাইকে গোপনে ডাকিয়ে এনে তার সঙ্গে মা'র কাছে চলে গেল বউ।

সন্ধ্যায় রহিম ঘরে ফিরে এল। পাশের বাড়ির বউ অনেক ভেবেচিন্তে সাহস করে এগিয়ে এসে রহিম খানকে বউয়ের চলে যাবার খবর জানাল। কেন জানি, আজ রহিম ক্ষেপল না। চুপচাপ শুধু শুনে গেল। তারপর বলদদুটোকে রাত্রির জন্য বাঁধতে গেল ঘেরা-উঠানে। সে নিশ্চিত জানে বউ আর কখনো তার কাছে ফিরে আসবে না।

উঠোন থেকে রহিম ঘরে ফিরে এল। নির্জন, নিস্তব্ধ। না, একেবারে শব্দহীন নয়, একটা বিড়াল ম্যাও-ম্যাও করে চলেছে। লেজ ধরে বিড়ালটাকে ছুঁড়ে মারল রহিম। তারপর চুলোর কাছে গেল। ঠাণ্ডা চুলো। রাজ্যের আলসেমি বোধ করতে লাগল সে। চুলো ধরিয়ে নিজ হাতে রান্না করা তার হল না। পেটে কিছু না-দিয়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল রহিম। কিছুক্ষণ পর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সূর্য ওঠার অল্প পরেই তার ঘুম ভাঙল। আজ কাজে যাওয়ার তাড়াহুড়া নেই। ছাগলগুলোর দুধ দুইয়ে তাই খেল সে। হুঁকোটা সাজিয়ে নিয়ে বসল বিছানায়। সূর্যের আলোয় ততক্ষণ ঘর ভরে গেছে। ঘরের কোণায় রহিম খান কতগুলো মাকড়সার জাল দেখতে পেল। ওগুলো সরানো দরকার। বাঁশের লাঠির আগায় কিছুটা ন্যাকড়া বেঁধে সে জাল ভাঙতে গেল। সিলিং-এ এক চড়ুইয়ের বাসা হঠাৎ তার নজরে পড়ল। দুটো চড়ুই উড়ে একবার করে বাসায় ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

এ বাসা ভাঙতে হবে—প্রথম-প্রথম এমনি চিন্তায় রহিম থেমে গেল। একটা টুল নিয়ে এসে সে চড়ুইয়ের বাসায় উঁকি মারল। হৃষ্টপুষ্ট দুটো বাচ্চা ভিতরে কিচিরমিচির করছে আর তাদের বাপ-মা মাথার উপর উড়ে-উড়ে তাদেরকে সম্ভাব্য আপদ-বালাই থেকে রক্ষা করছে। বাসার দিকে হাত বাড়াতেই মাদি চড়ুই তার মাথায় ঝাপটা মারল

সঙ্গে-সঙ্গে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে রহিম হেসে উঠল, 'নচ্ছার। আমার চোখদুটো উপড়ে নিতে চাস?' টুল থেকে নেমে পড়ল রহিম। বাসা ভাঙা হল না আর।

পরের দিন থেকে রহিম আবার মাঠের কাজে মন দিল। গ্রামের কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। সারাটা দিন সে মাঠে হাল দেয়া, পানি সেচ দেয়া বা ফসল কাটায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই সে এখন ঘরে ফিরে যায়। হুঁকা ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চড়ুইগুলোর লাফ-ঝাঁপ দেখতে থাকে নিবিষ্ট মনে। বাচ্চাদুটো এখন উড়তে শিখেছে। ছেলেদের নামে একটা বাচ্চাকে সে নুরু, আরেকটাকে বুন্দু বলে ডাকে। পৃথিবীতে এখন রহিমের বন্ধু বলতে চারটি চড়ুই। গ্রামের সবাই তাকে এড়িয়ে চলে সত্যি, কিন্তু হঠাৎ সবার খেয়ালে আসে, আজকাল রহিম তার বলদদুটোকে মারধর করে না। নাথু আর ছিদুও এখন ছাড়া পেয়ে খুব খুশি। ওদের পিঠের উপরের ক্ষতগুলো প্রায় সেরে গেছে। একদিন সকালেই রহিম খান মাঠ থেকে ফিরছিল। রাস্তায় কতকগুলো ছেলে খেলায় মত্ত। রহিমকে দেখেই ওরা জুতা-টুতা ফেলে ভোঁ-দৌড়। রহিম পেছনে-পেছনে দৌড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে শোন, শোন। পালাস নে। মারব না তোদের, শোন।' কে শোনে জালিমের কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। শিগগিরই হয়তো বৃষ্টি নামবে। বাড়ির দিকে রহিম জোরে পা চালাল। বলদদুটোকে উঠোনে বেঁধেছে মাত্র, অমনি শোঁ-শোঁ ঝড় উঠল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রহিম খান। বাতিটি জ্বালাল প্রতিদিনের মতো। আজো সে কয়েক টুকরো রুটি চড়ুইগুলোর কাছাকাছি একটি কুলুঙ্গিতে রেখে ডাকতে লাগল, 'কই রে নুরু, কই রে বুন্দু।' আজ নুরু-বুন্দু বাইরে এল না। ব্যাপার দেখতে রহিম চড়ুইয়ের বাসায় উঁকি দিল। দেখল চারটা চড়ুই-ই ডানায় মাথা গুঁজে জড়াজড়ি করে বসে আছে। সিলিং-এর এক ছিদ্র দিয়ে আসা ফোঁটা-ফোঁটা পানি বাসাটা ভিজিয়ে ফেলেছে।

'এমনভাবে পানির ফোঁটা পড়তে থাকলে বাসাটা পয়মাল হয়ে যাবে। বেচারাদের তখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে না।' বৃষ্টি-মাথায় রহিম দেয়ালে মই লাগিয়ে চালে উঠল। চালের বৃষ্টি-চোয়ানো ছিদ্রটা বন্ধ করতে বেশ সময় নিল। আর ততক্ষণে সে নিজে ভিজে একাকার। ঠকঠক করে কাঁপছে ঠাণ্ডায়। ঘরে এসে বিছানায় বসতে-না-বসতেই হঠাৎ হাঁচির তোড় শুরু হল। রহিম খান থোড়াই তোয়াক্কা করে এই হাঁচির। পরদিন সকালে কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারল না সে। জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই যে তার ওষুধ এনে দেবে।

এমনিভাবে দুদিন কেটে গেল।

দুদিন রহিম খানকে মাঠে যেতে না-দেখে গ্রামবাসীরা কৌতূহল বোধ করল। চৌকিদার কয়েকজন চাষিকে সঙ্গে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে রহিম আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'ওরে বুন্দু-নুরু, কোথায় গেলি তোরা? কে তোদের আজ খাবার দেবে? কেউ নাই রে!' চারটা চড়ুই তখন সিলিং-এর কাছে উড়ে ঘুর-ঘুর করছে।

কালু অর্থপূর্ণ মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটা পাগলই হয়ে গেল শেষে। সাত সকালেই কাল হাসপাতালে খবর পাঠাতে হবে। ওরা এসে মনে হলে না-হয় পাগলাগারদেই নিয়ে যাবে।'

পরদিন গাঁয়ের লোক হাসপাতালের এক কর্মচারীকে নিয়ে যখন রহিমের ঘরে ঢুকল, রহিম তখন বেঁচে নেই। ঘরের ভিতর চঞ্চল চারটা চড়ুই শুধু ঘুরঘুর করে উড়ছে।

পর্যটক

কুররাতুল আইন হায়দার

গত বছর এক সন্ধ্যায় দরজায় ঘণ্টা বাজল। আমি বাইরে এলাম। এক লম্বা ছিপছিপে ইউরোপীয়ান ছেলে ক্যানভাসের থলে কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ঝোলানো রয়েছে দ্বিতীয় একটি থলে। পায়ে ধুলিমলিন পেশোয়ারি চপ্পল। আমাকে দেখে বিনীত হয়ে নাম জিজ্ঞেস করল। তারপর একটা খাম এগিয়ে দিলে বলল,

'আপনার মামার চিঠি।'

'ভেতরে এস।'

আসান মামুর চিঠি। তিনি লিখেছেন, আমরা করাচি থেকে হায়দারাবাদ (সিন্ধু) ফিরে যাচ্ছিলাম। থাটের মাকালি হিলের কবরের মাঝে ছেলেটি বসেছিল। আংটি দেখিয়ে পাথেয় চাইলে আমরা তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছি। ছেলেটি বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়েছে। এখন ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে। অটো বড় ভালো ছেলে। আমি তাকে ভারতীয় আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা লিখে দিয়েছি—সে তাদের কাছে থাকবে। তুমিও তাকে আতিথ্য দিও।

নোট : ওর কাছে সম্ভবত টাকাকড়ি নেই।

ছেলেটি কামরায় এসে মেঝেতে থলে রাখল। তারপর চোখ রগড়ে দেয়ালের ছবি দেখতে লাগল। এত লম্বা ছেলেটির মুখখানা বাচ্চার মতো ছোট। তার ওপর আবছা সোনালি দাড়ি-গোঁফে বড় আশ্চর্য লাগছে।

এ দেখছি আর এক আপদ। আমি একটু বাঁকা করে ভাবলাম। আসান মামুর মতো ফেরেশতা চরিত্রের লোকটা এর কব্জাতে পড়ে গেল কী করে? এরা হল বিশ্বপর্যটক। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পথিকদের বন্ধুত্ব পাতানোতে এরা বেশ ওস্তাদ।

'শাহেদাও আপনাকে সালাম বলেছে।' সে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল।

'শাহেদা?'

'হ্যাঁ, আপনার কাজিন। বেনারসে আমি তাদের ওখানে ছিলাম। আর লক্ষ্ণৌতে আপনার ফুফুর বাড়িতে। চাটগাঁতে গিয়ে থাকব আপনার আঙ্কলের কাছে। আর যদি দার্জিলিং যেতে পারি তো আপনার কাজিন তাহেরার ওখানে উঠব।'

সে পকেট থেকে আরো একটা লম্বা লেফাফা বের করল।

'বসে যাও অটো, চা খাও।' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে পড়ল সেই দুজন ডাচ পর্যটকের কথা, যারা করাচি এসে হামেদ চাচার ওখানে ঘাঁটি করে বসেছিল। তাদেরও পয়সা-কড়িও শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

'আমি তুরস্ক এবং ইরান হয়ে এসেছি। জার্মানি থেকে এ-পর্যন্ত মোটর এবং লরিতে লিফট পেয়েছি। এখন যাব লংকা। তারপর থাইল্যান্ড ইত্যাদি। সেখান থেকে কার্গো বোটে চড়ে জাপান, আমেরিকা। তারপর বাড়ি পৌছব। এখানে আমি আওরঙ্গাবাদ থেকে ট্রাকে চড়ে এসেছি।'

'তোমার এ-সফর বেশ রোমাঞ্চকর দেখছি।'

'হ্যাঁ, ইস্তাম্বুলে তিনরাত আমি গ্যালাটার পুলের নিচে ছিলাম। আর ইরানে—'

তারপর বিভিন্ন ছোটখাট এডভেঞ্চার শুনিয়ে বলল, 'আমি কলোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'

'সেখানে সবাই আমার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে খুব বেশি রকম আলোচনা করে। অথচ এখানে কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের আলোচনা খুব কম হয়। এখানকার আসল সমস্যা হল—'

বলতে গিয়ে সে ভারতের সমস্যাবলি সম্পর্কে বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। তারপর একটু থেমে শুরু করল—

'আমি ধনী পর্যটক এবং সাধারণ ইউরোপীয়দের মতো শুধু তাজমহল দেখতে আসিনি। আমি রাতভর দোকানের বারান্দায় শুয়ে থাকি। কৃষকদের ঝুপড়িতে কাটাই, মজুরদের সাথে ভাব করি—যদিও আমি তাদের ভাষা বুঝতে পারি না।'

খাওয়ার পর সে বোম্বের মানচিত্র বের করে মেঝেতে রাখল।

'বেচারি ইংরেজ বোম্বাইয়ের স্থাপত্যরীতিকে ভিকটোরিয়ান গথিক বলে ধরে নিয়েছে। এখানে কী কী দেখবার মতো আছে, বলুন দেখি।'

'কেন, এলিফ্যান্টা—আপালু বন্দর আর...'

'এ সব তো গাইড বুকেও আছে।'

সে অধৈর্য হয়ে আমার কথা কাটল এবং ভারতের জীবনব্যবস্থা ও রীতিনীতির ওপর বড় ভারি এবং উদাহরণ সমৃদ্ধ আলোচনা করে শোনাল।

'অটো, তোমার বয়স কত?'—আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

'একুশ। যখন জার্মানিতে গিয়ে পৌছব তখন হবে বাইশ। তার পরের বছর আমি ডকটরেট পাব। আমি জার্মানির গীতিকাব্যের ওপর গবেষণা করছি। জার্মানিতে শুধু ডকটরেট দেয়, যেমন আপনাদের এখানে বি.এ., এম.এ।'

এরপর বহুক্ষণ সে জার্মানির গীতিকাব্য, বিশ্ব রাজনীতি মায় ভারতের শিল্পকলার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। সে নাকি ছবিও আঁকে। কী রকম ডাকসাইটে ছেলে—আমি মনে-মনে বললাম। জার্মানদের মতোই মার্জিত এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন সে।

'আমি রাত্রে শোবার আগে আপনার বইগুলো দেখতে পারি?'

'অবশ্যই।'

রাতভর বসার ঘরে বাতি জ্বলল। সকাল তিনটায় গোসলখানায় পানি ঝরার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। সে নেয়ে-ধুয়ে একদম সাফসাফাই, যাতে তার জন্যে বাড়ির কারো অসুবিধা না-হয়। নাস্তার সময় সে রাতভর পড়ে শেষ করা পুস্তকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সম্পর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করল। তারপর বোম্বের মানচিত্র বের করে বেরিয়ে পড়ল ভ্রমণে।

কামরা ঠিক করার সময় হঠাৎ তার থলেতে আমি চারটি বই দেখলাম : গ্যেটের ফাউস্ট, হাইনের কাব্য, রিলকে, ব্রেশট এবং পবিত্র ইঞ্জিল।

সন্ধ্যায় সে ভারি ক্লান্ত এবং বিবর্ণ হয়ে ফিরলে আমি বললাম,

'অটো, কাল রাতে তুমি তো খোদার বিরুদ্ধে ছিলে—অথচ ইঞ্জিল সাথে নিয়ে ঘুরছ।'

একথা শুনে অটো খোদার ধ্যানে আবেগ-অন্ধ মানবিক বাধ্যতার ওপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে ফেলল।

'অটো, তুমি এলিফ্যান্টা গিয়েছিল? সেখানকার ত্রিমূর্তি আর দেবতা—'

'আমি কোথাও যাইনি। সারাদিন ভিকটোরিয়া গার্ডেনে বসে ভিড়-জমা মানুষদের দেখেছি। মানুষ—মানুষই সবচে বড় দেবতা।'

'হ্যাঁ, তা তো বটে। কিন্তু তুমি খেয়েছ কোথায়?'

'আমি এক ডজন কলা কিনে নিয়েছিলাম।'

হঠাৎই আমি খুব লজ্জিত হলাম। যাবার সময় কিছু খাবার দিতে আমার কেন মনে ছিল না ভেবে লজ্জা লাগল। আসান মামুর কথাও মনে পড়ল, সম্ভবত ওর কাছে পয়সা-কড়ি নেই।

খাবার টেবিলে সে বলল, 'আমি অনেক দিন পর পেটপুরে খাচ্ছি।'

আমি তার সঙ্গে জার্মানির আলোচনা করতে লাগলাম। বার্লিনের প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে জানিয়ে দিল যে, সে পাক্কা এন্টি-কম্যুনিস্ট।

'বাড়িতে আমার মা আমার জন্যে মজার-মজার খাবার তৈরি করে। আপনি মাকে দেখলে খুব খুশি হতেন। মায়ের বয়স এখন বিয়াল্লিশ। নানান বিপদ-আপদ বেচারিকে অকালে বুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনো মা সুন্দরীদের একজন।'

'তুমি কি তার একমাত্র ছেলে?'

'হ্যাঁ, আমার পিতা সৈন্যবিভাগের অফিসার ছিলেন। মায়ের বাড়ি প্রসা। মায়ের বয়স যখন সতেরো তখন বাবার সাথে বিয়ে হয় তাঁর; এর কিছুদিন পরই বাবা পোল্যান্ডের যুদ্ধে নিহত হন। তার পরের মাসেই আমার জন্ম। বোমা বিস্ফোরণ থেকে বাঁচবার জন্যে মা আমাকে কাঁধে করে নানা জায়গায় ফিরতেন। আমাকে কোলে নিয়ে, মাথায় রুমালের ফলবুট পরে, সামান্য আসবাবপত্র প্রেম্বুলেটরে এঁটে গ্রামে-গ্রামে ঘুরতেন আর ক্ষেতখামারে লুকিয়ে থাকতেন। মা যখন পোল্যান্ডের এক গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন তখন সৈন্যেরা ঘরে আসে। আমার বয়স তখন বছর চারেক। আমার শৈশবের অবিস্মরণীয় স্মৃতি এই ভীষণ রাতটা। ভয়ে আমি পালঙ্কের নিচে লুকালাম। লোকেরা যখন মাকে টেনে নিয়ে গেল আমি জোরে-জোরে কাঁদতে লাগলাম। মাকে ওরা টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। এর পর মা ভয়ে ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে বেশ ক'দিন পর ফিরলেন। এদিকে আমি খালি ঘরে একা। বাইরের গোলাগুলির আওয়াজ ঘরের ভেতর ছমছম করে বেড়াত। বাবুর্চিখানা এবং ভাঁড়ারের আলমারি খুলে আমি খাবার তালাশ করতাম। যা কিছু পেতাম তাই ক্ষুধার জ্বালায় খেয়ে ফেলতাম। আলমারিগুলোর তাক ছিল অনেক উঁচুতে। সেখানে অনেক খাবারও ছিল। কিন্তু আমি নাগাল পেতাম না।'

এতটুকু বলে সে চুপসে গেল। খেতে থাকল নীরবে।

'চালের খাবার খুব ভালো লাগে।' কয়েক মিনিট পর সে আস্তে করে বলল, 'এই জন্যে পারলে আমি যুদ্ধের ধ্বংসকাহিনী পড়ি না।' বড়দের কাছ থেকে শোনা এমনি আরো অসংখ্য বীভৎস কাহিনী শুনেছি। আমার সেই ফরাসি মেয়েটির কথা মনে পড়ছে, যে এই অটোরই স্বজাতি জার্মানদের মৃত্যুলীলার কাহিনী শুনিয়েছে। এই পোল্যান্ডেই যেখানে অটো এবং তার মায়ের এই দুরবস্থা হয়েছিল, নাৎসিরাও রাতদিন সেখানে কাজ করছে। সেখানে রোজ হাজারো ইহুদিদেরকে নিষ্ঠুর মৃত্যুযন্ত্রে নিক্ষেপ করা হত। ব্রিটিশের গোলা-বারুদ এ-অঞ্চলকে করে দিয়েছিল একেবারে ধ্বংসস্তূপ। আমার সেই রুশ বালিকার কাহিনীও মনে পড়ল। কে যেন শুনিয়েছিল কাহিনীটি। নিজের গোটা পরিবারকে জার্মানদের নির্মম মেশিনগানের সামনে আহুতি দিতে দেখে ভয়ে-বিভীষিকায় পলকের মধ্যে তার মাথার সব চুল শাদা হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এরা সবাই উনিশ শ পঁয়তাল্লিশোত্তর ইউরোপের নবীন বংশধর।

মানবতার সেবক যিশুর অনুসারী পশ্চিম ইউরোপ তার সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে কী দিয়েছে!

'তোমার মা এখন কী করেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনি এখন হাউস-কিপার। সামরিক বিধবা হিসেবে পেনশন পান। আমাদের দু কামরার ছোট ঘর। আমি সন্ধের শিফটে এক ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। আমার মা খুব ভালো। এসট্রলজিতে পূর্ণ বিশ্বাসী, রীতিমতো গির্জায় যান। গত বছর আমি সাইকেলে সারা জার্মানি ভ্রমণ করেছি। জার্মানি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ।'

'সব দেশই তার বাসিন্দাদের কাছে সুন্দর। কিন্তু তুমি নব্য-নাৎসি যেন না-হয়ে ওঠ।'

'না আমি নাৎসি হব না। ইহুদিদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা নেই।'

সে সহজে বলল। আমার হাসি পেল।

'আমার মাতুলরা এখনো পূর্ব জার্মানিতে রয়েছে। যেমন আপনাদের কিছু লোক এখানে, আর কিছু পাকিস্তানে।' সে ম্যাপ দেখিয়ে বোঝাল।

দ্বিতীয় দিন সে কথা দিয়েছিল শহরের দর্শনীয় সব কিছু দেখবে। কিন্তু সে দিনও সারাক্ষণ সে রানিবাগে বসে কাটাল।

চতুর্থ দিন ছেলেটা ওয়ার্ডেন রোডে ভুলা ভাই দেশাই ইন্সটিটিউটের বারান্দায় বসে লাওস যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ে দিনটা কাটিয়ে দিল।

ভেতরে মেয়েরা নাচ শিখছিল আর হলঘরে হুসেনের নতুন চিত্র-প্রদর্শনী হচ্ছিল।

বোম্বের সব দূরত্ব সে পায়ে হেঁটে পার করত। ওয়ার্ডন রোড থেকে ফ্লোরা ফাউন্টেন অবধি সে পায়ে হেঁটে গেছে। আমার মনে হত, জার্মান জাত নিঃসন্দেহে জীন বা দেও জাত-সম্ভূত।

'আমি আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত রোজ খরচ করি। প্রায়ই কলা খেয়ে থাকি। সবখানেই অতিথিপরায়ণ লোক মিলে যায়। কেমন আশ্চর্য দেখুন, মানুষ এককভাবে কত সাদাসিধে এবং নিষ্পাপ, অথচ সমষ্টির আবর্তে সে পশুর মতো।'

সে মুখ উঁচু করে বসল। সেদিন সে এক ট্রাক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে এসেছে। বাঙ্গালোর অবধি সে ট্রাকে চড়ে যাবে। খুব সকালে সে তার বই-পত্র, কাপড়-চোপড়, তাঁবু

আর বিছানা দিয়ে থলে দুটি ভরে কাঁধে তুলে নিল। এবং খোদা হাফেজ বলে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস ফ্লোরা ফাউন্টেনে যাবার উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা দিল।

অটো চলে গেছে কয়েক মাস হল। আসান মামুর চিঠি এলে আমি তাকে অভিযোগ করে লিখলাম, অটো এখান থেকে সেই যে গেল আর একটা খবরও দিল না, সে এখন কোথায়-কোথায় ফিরছে। আসান মামুর চিঠি ডাকে দিয়ে ফিরতেই বিকেলের ডাকে অটোর চিঠি এল। খামে লাওসের রাজার ছবি। চিঠিতে লিখেছে—

'সেই জার্মান ছেলেটি, যে আপনার বাড়িতে দিনকয় ছিল আপনাকে ভুলে যায়নি। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। (মাফ করবেন, আমি ইংরেজিতে দুর্বল) আপনি আমাকে বড় বোনের মতো স্নেহ দিয়েছেন। আমি ভালোবাসায় আস্থাবান। এর কারণ হয়তো আমি এখনো কমবয়সী। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীতে সে-সব লোকেরাই সুখী, যারা কোনো দিকে না-দেখে, প্রশ্ন না-করে সবকিছু মেনে নেয়। আমরা যতই প্রশ্ন করছি ততই মনে হচ্ছে যে, জীবনটা নিছক অর্থহীন।

লংকায় নিউরেলিয়া থেকে কেনেডি পর্যন্ত এক টুরিস্ট বাসে গিয়েছি। বাসে এক সিংহলি ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সে আমাকে খাইয়েছে। নাম তার রাজা। সে আমার জন্যে পথ থেকে কিছু ফুলও কিনেছে। বাসে ক'টা ঢোল ছিল। রাজা সেগুলো বাজিয়ে গান গেয়েছে। আমার খুব ভালো লেগেছে সে গান। এক সময় রাজা আমাকে বলল, চল, স্নান করি। অথচ কয়েক মিনিট পরে সে মরে গেল। হঠাৎ পানিতে ডুবে গিয়েছিল। দু'ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর আমরা তার শব একটা বাঁকের নিচে পেলাম। এসব কী? আমি ভাবতে লাগলাম, এমন হল কেন? আমাদের কেউই রাজাকে বাঁচাতে পারল না। এটা কি ঘটনাচক্রে ঘটল, না এটাই তার ভাগ্য? রাজা মা-বাবার একমাত্র ছেলে। তার বোন এবং ভাইও পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে মরেছে। তার বাপ অন্ধ। মা-ও বড় রুগ্ণা, রাজাই তাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

মাদ্রাজের এক যুবক কবি আমাকে জানাল, এই পৃথিবীর কারণে সে খুব দুঃখী। মাদ্রাজে আমি রেডিও ইন্টারভিউ দিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করেছিলাম। সেখান থেকে আমি এসেছি পেনাং। খুব সুন্দর দ্বীপটা। এখানে অনেক চীনা থাকে।

এক মালগাড়ির শেষ ডাব্বায় চড়ে আমি ব্যাংককে পৌঁছেছি। এখানে এক বৌদ্ধ মন্দিরে থাকি। মন্দিরের যাজকদের সঙ্গে আমি খাবার খাই। দ্বিপ্রহরের সময় সুন্দরী মেয়েরা এবং মহিলারা নানা বেশ-ভূষায় তাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে যাজকের কাছে আসে।

বেশিরভাগ ভিক্ষুই প্রেম-পিয়াসী। দেদার তামাক টানে। কোনো কাজ করে না। ধর্মভীরু বৃদ্ধরা তাদের খাবার এবং পয়সা জোগায়। অনেক ভিক্ষুই মন্দিরে এসেছে পরিশ্রম ভালো লাগে না বলে। লোকগুলো ভারি দুর্বল। তাদের ধর্মে এই হীনতার এক সুস্পষ্ট বৈধতাও বিদ্যমান। এদের অনেকে যথানিয়মে শুচি হয়ে যোগসাধনায়ও বসে। বেশিরভাগ ভিক্ষুই খাওয়া এবং মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া বাকি সময় শুয়ে-শুয়ে কাটায়।

নাংকাইতে আমি মেকং নদীতে স্নান করেছি। তারপর চলে এসেছি লাওসে।

দিয়েন ভিয়েন একটা বড় গ্রামের মতো। রৌদ্র বড় কড়া। সড়কগুলো ধুলোয় ধূসর। শুধু রাতগুলো বড় সুন্দর। অন্ধকার সব কদাচার, অত্যাচার, হানাহানি এবং রক্তপাত বুকে লুকিয়ে নেয়। এখানে মশা খুব বেশি।

সুফানা অবধি এক প্লেনে ফ্রি লিফট পেলাম। এখন আমি পাকশাতে আছি। তারপর যাব কম্বোডিয়া। আঙ্কল আহমদের ওখানে মানে চিটাগাংয়ে যেতে পারিনি। বর্মায় প্রবেশ করতে হিমশিম খেয়ে গেছি। আমি লালচীন এবং ভিয়েতনামের ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছি। পিকিং বা হ্যানয়ে গিয়ে জবাব পেয়ে যাব। কাল আমি এখান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাচ্ছি।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ
'অটো'

উনিশ শ তেষট্টির এক বিদেশি পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'ভিয়েতনামের অরণ্যপুরী' শীর্ষক রঙিন সচিত্র প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে রয়েছে গেরিলা সৈন্যদেরকে গুলি করে মারার দৃশ্য। নৌকায় করে গেরিলা কয়েদিদেরকে মেকং নদী পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কৃষাণ মেয়েরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওপারে পৌছলে তাদেরকে গুলি করে মারা হবে। প্রবন্ধের শেষ দিকে দু পৃষ্ঠাব্যাপী রঙিন ছবি। তাতে সজীব ধানক্ষেতের দৃশ্য। ধানের শীষ হাওয়ায় দুলছে। প্রান্তসীমায় গাছের লম্বা পাতা দুলছে। সবুজ সতেজ বনানী আর তার পাশে ছলছল করা নদী। বড় মনোরম দৃশ্য। শিল্পী যা দেখে ছবি আঁকে, কবি কবিতা লেখে, আর গাল্পিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকায় গল্প লেখে ঠিক তাই। কিন্তু এ-ছবির শেষদিকে বিস্রস্ত বিবর্ণ অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত এক যুবক পড়ে আছে। কিছু দূরে কালো রঙের যুদ্ধবিমান দাঁড়িয়ে আছে ভয়াল দানবের মতো। ছবির নিচে লেখা রয়েছে,

'মৃত্যুর খামার'

একজন ভিয়েতকং গেরিলা, যাকে মেকং নদীর ধানক্ষেতে মারা হয়েছে, তার সঙ্গীরা একে অপরের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে এক কোণে। এই রক্তাক্ত খণ্ড-যুদ্ধের সময় এক পর্যটক যুবক মেকং নদী পার হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাচ্ছিল। হঠাৎ ফসকে যাওয়া এক গুলি তাকে ভেদ করে যায়। এই সুন্দর দেশে ১৯৪৪ সাল থেকে যুদ্ধ চলে আসছে, এবং...।

লেখক পরিচিতি

প্রেমচন্দ
হিন্দি ও উর্দু কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দ-এর অবস্থান অনেকটা বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই পথিকৃতের। এক ঋষিকল্প নির্মোহে তিনি সমাজের অন্ত্যজ মানুষের গাথা রচনা করে গেছেন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। ৫৬ বছরের (১৮৮০-১৯৩৬) সংক্ষিপ্ত জীবনে এই লেখক প্রায় ষোলটি উপন্যাস এবং আড়াইশ'র মতো ছোটগল্প ছাড়াও নাটক, প্রবন্ধ, ইত্যাদি লিখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'সেবাসদন', 'প্রেমাশ্রম', 'গবন', 'গোদান' এবং ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে 'কফন', 'সদগতি', 'পৌষের রাত', 'গুলিডাণ্ডা', 'পরীক্ষা', 'বড় ঘরের মেয়ে' ইত্যাদি। তাঁর আসল নাম ধনপত রায় কিন্তু ইংরেজ রাজরোষ এড়াবার জন্য প্রেমচন্দ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের দিকপাল হিসেবে তিনি এই নামেই এখন পরিচিত।

কৃষণ চন্দর
উর্দুসাহিত্যে কৃষণ চন্দর (১৯১৫—১৯৭৭) অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লেখক। তাঁর লেখা ছোটগল্প সংকলন, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য সব মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশ'। স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন 'নেহেরু স্মৃতি পুরস্কার' এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি। জটিলতাহীন সহজ আটপৌরে ভাষায় লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাস সহজেই পাঠককে প্রভাবিত করে। বাষট্টি বছর বয়সে কৃষণ চন্দর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সেরা উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'গাদ্দার', 'আমি গাধা বলছি', 'যবখেত জাগে', 'পরাজয়', 'অন্নদাতা' এবং ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস', 'জামগাছ', 'জঞ্জাল বুড়ো', 'ভরা চাঁদের রাত', 'চৌরাস্তার কুয়া' ইত্যাদি।

রাজেন্দ্র সিংহ বেদী
উর্দু কথাসিহিত্যক রাজেন্দ্র সিং বেদীর অবস্থান একটি ভিন্নমাত্রায়। তিনি গল্পে সমকাল প্রভাবিত সামাজিক সভ্যতা এবং সমাজের ব্যক্তিমানুষের মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। ফলে সাধারণ মানুষ তার সার্বিক পরিস্থিতির ভেতর থেকে নিজস্ব ইচ্ছা, ব্যর্থতা, ক্ষমতা ও অক্ষমতা সমেত বেদীর গল্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—আমরা চরিত্রটির ভেতরের এবং বাইরের সবটুকু রূপ দেখতে পাই। গল্পে এই কাজগুলো করতে গিয়ে তিনি উর্দু অন্যান্য লেখকদের মতো ভাষার জনপ্রিয় রূপটি একেবারে এড়িয়ে গেছেন—যে কারণে তাঁর পাঠকপ্রিয়তাও অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা কম। 'মিথুন', 'তোমার দুঃখ আমাকে দাও', 'বব্বক', প্রভৃতি গল্পগুলো তাঁর সেরা কাজের অন্যতম।

সাদাত হাসান মান্টো

অত্যন্ত জনপ্রিয় এই লেখক চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে (১৯১২—১৯৫৫) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সিংহভাগ গল্প-উপন্যাসের চরিত্র হচ্ছে সমাজের বিকারগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ ও যৌন-বিকৃত মানুষ। এক সময় বোম্বের চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের মতো। মান্টোর সেরা গল্পের মধ্যে ধরা হয় 'ঠাণ্ডা গোশ্‌ত', 'খুলে দাও', 'গন্ধ' ইত্যাদি। 'বিশ্বের সকল যন্ত্রণার জননী হচ্ছে ক্ষুধা' উর্দুসাহিত্যে ব্যাপক পরিচিত উক্তিটির লেখক মান্টো সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে বেশ কয়েকবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হন।

খাজা আহমদ আব্বাস

খাজা আহমদ আব্বাস (১৯১৪) উর্দুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠকপ্রিয় লেখক। গল্পের সংখ্যা তাঁর প্রায় শতাধিক। উপন্যাস আছে সাতটির মতো। চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ রচনা, চিত্র পরিচালনা ও চিত্র প্রযোজনার কাজ করেছেন এক সময়। তাঁর কয়েকটি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর লেখার ভঙ্গি সহজ সরল। 'প্রতিশোধ', 'সর্দারজি', 'চড়ুই পাখি' ইত্যাদি গল্পগুলো তাঁর লেখকশৈলীর পরিচয় বহন করে।

কুররাতুল আইন হায়দার

উত্তরপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে কুররাতুল আইন হায়দারের জন্ম। ইংরেজিতে এম.এ. করে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য 'ডেলি টেলিগ্রাফ'-এর সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। বিবিসিতেও ছিলেন কিছুদিন। পরে ভারতে ফিরে এসে 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'র সহকারী সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করেন। উর্দুসাহিত্যে তাঁকে প্রথম সারির সাহিত্যিক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সাতটি উপন্যাস, তিনটি গল্প সংকলন এবং বেশ কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কুররাতুল আইন হায়দারের। 'পর্যটক', 'কারমিন', 'সেই দুটো চোখ', গল্পগুলো তাঁর অধিক পরিচিত।

গোলাম আব্বাস

উর্দুসাহিত্যে যদিও গোলাম আব্বাস একটি সুপরিচিত নাম—এক স্বল্প অনুবাদের কারণে তিনি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকসমাজে অল্প পরিচিত। ফলত আমরা তাঁকে সংকলনভুক্ত করলাম।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি '**চিরায়ত গ্রন্থমালা**'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র